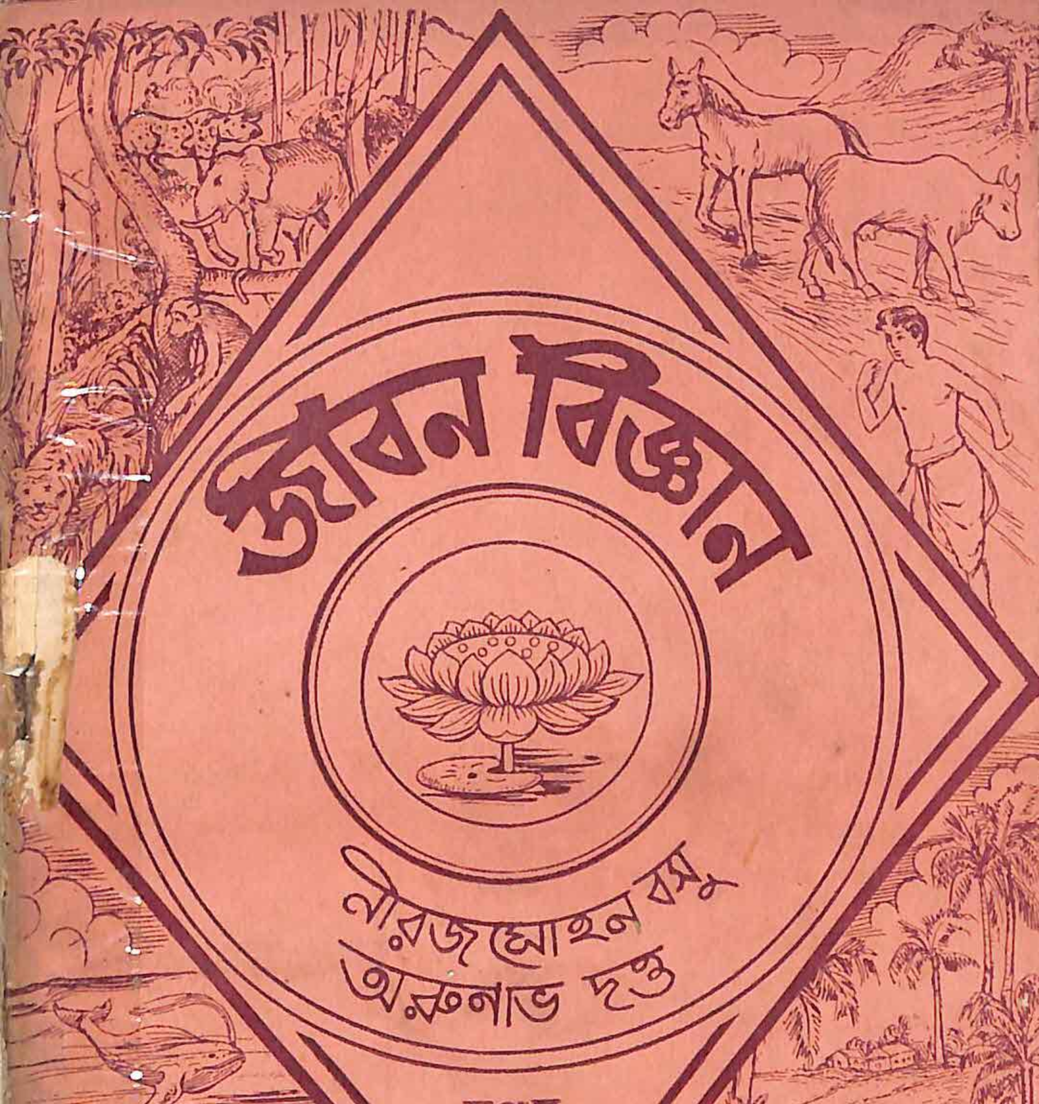


জীবন বিজ্ঞান

নীরজমোহন বসু
অরুণাভ দত্ত

সপ্তম
শ্রেণী

বি. বি. ব্রাদার্স এণ্ড কোং
বি
কলিকাতা-১২

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ কর্তৃক ১৯৭৪ সালের স্থিরীকৃত নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে সপ্তম শ্রেণীর জন্য লিখিত।

[Vide vol. I of the Curriculum and Syllabuses for Reorganised Pattern of Secondary Education]

জীবন বিজ্ঞান

দ্বিতীয় ভাগ

[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

অধ্যাপক ডাঃ নীরজমোহন বসু, এম্. এস্-সি., এম্. বি.
সিটি কলেজের প্রাণিবিদ্যার ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও রামমোহন কলেজের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক, "সরল বিজ্ঞান" ও "জীবন বিজ্ঞান" (ষষ্ঠ শ্রেণী)-এর অন্যতম গ্রন্থকার

ও

অধ্যাপক অরুণাভ দত্ত, এম্. এস্-সি. (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা),
এম্. এস্-সি. (প্রাণিবিদ্যা)
সিটি কলেজের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার অধ্যাপক, এন. সি. ই. আর. টি.-র ভূতপূর্ব সভ্য, আনন্দমোহন কলেজ, বিজয়নারায়ণ কলেজ ও নেতাজী কলেজের (আরামবাগ) ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও "জীবন বিজ্ঞান" (ষষ্ঠ শ্রেণী)-এর অন্যতম গ্রন্থকার

প্রণীত

বি. বি. ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৬।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীদেবনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এস্-সি.
বি. বি. ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৬।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৭৪

মূল্য—2 টাকা 95 পয়সা মাত্র।

[Paper used for printing this book was made available by the Government of India at a concessional rate]

মুদ্রাকর :

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শঙ্কর প্রিন্টার্স
২৭।৩ বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডা
আদি মুদ্রণী
৭১, কৈলাশ বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা জীবন বিজ্ঞান (ষষ্ঠ শ্রেণী) লিখিয়াছি তাহা মনে রাখিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি রচনা করিতে সাহসী হইলাম। আমরা কৃতার্থ হইব, যদি ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্তের গভীরে ইহা কিছুটা আলোকপাত করে।

ইতি
লেখকদ্বয়

কলিকাতা
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৭৪

সূচীপত্র

জীবন বিজ্ঞান

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের লক্ষণ দ্বারা চিনিবার উপায় ও তাহাদের সহিত পরিচিতি

তোমরা উদ্ভিদ জগৎকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করিলে তাহাদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ও বৈষম্য দেখিতে পাইবে। প্রত্যেকটি উদ্ভিদের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে ও অন্যান্য উদ্ভিদের সহিত তাহাদের সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। ব্যাঙ-এর ছাতা এবং মিউকরের মধ্যে সাদৃশ্য থাকায় তাহাদের একটি শ্রেণীতে ফেলা হয়। স্পাইরো-গাইরা এবং ভলভক্সের মধ্যে সাদৃশ্য থাকায় তাহাদের আর একটি অন্য শ্রেণীতে ফেলা যায়। এই দুই শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে আবার কয়েকটি সাধারণ সাদৃশ্য থাকায় তাহাদের একটি সাধারণ শ্রেণীতে ফেলা হয়। এইরূপে আম, নারিকেল, পাইন প্রভৃতি উদ্ভিদকে একটি বৃহৎ শ্রেণীতে ফেলা হয়। ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈষম্য রহিয়াছে। এই সকল উদ্ভিদ অর্থাৎ স্পাইরোগাইরা, ব্যাঙ-এর ছাতা, ফার্ণ, আম, নারিকেল, পাইন প্রভৃতির মধ্যে আবার কয়েকটি সাধারণ সাদৃশ্য থাকায় তাহাদের উদ্ভিদ জগতে ফেলা হয়।

আমরা যদি আমাদের পরিচিত নানাপ্রকার প্রাণী লক্ষ্য করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈষম্য রহিয়াছে। প্রত্যেকটি প্রাণীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। কেঁচো এবং জোঁকের মধ্যে সাদৃশ্য থাকায় তাহাদের একটি শ্রেণীতে ফেলি। আরশুলা, প্রজাপতি প্রভৃতি কীটপতঙ্গের মধ্যে সাদৃশ্য থাকায় তাহাদের আবার একটি শ্রেণীতে ফেলি। এইরূপ আরো অনেক শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক কিছু সাদৃশ্য থাকায় তাহাদের একটি বৃহৎ শ্রেণীতে ফেলা হয়। অতিপরিচিত সাধারণ লক্ষণের দ্বারা গোরু, ঘোড়া, কুকুর

প্রভৃতিকে একটি শ্রেণীতে ফেলি আবার হাঁস, পায়রা প্রভৃতিকে অপর একটি শ্রেণীতে ফেলি। এইরূপ আরো অনেক শ্রেণীদের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য থাকায় তাহাদের একটি বৃহৎ শ্রেণীতে ফেলি। উপরোক্ত সকল শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে সাধারণ সাদৃশ্য থাকায় তাহাদের প্রাণিজগতে ফেলা হয়।

এই বৈষম্যের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজিয়া লইয়া, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইহাদের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে।

জীববিজ্ঞানে শ্রেণীবিভাগে, একটি অতি সরল মাপকাঠি আছে, একটি একক আছে যাহাকে বলা হয় প্রজাতি।

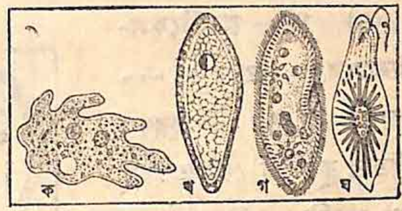
প্রাণিজগতে গোরু, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি প্রজাতির উদাহরণ। উদ্ভিদের লক্ষ লক্ষ উদাহরণের মধ্যে দুই একটি প্রজাতির নাম দেওয়া যাইতে পারে। যথা—ধান, গম, ডাল, আলু। ইহাদের প্রত্যেকের বৈজ্ঞানিক নাম সাধারণত লাতিন ভাষায় ব্যবহার করা হয়, জগতের সকল বৈজ্ঞানিকের বোধগম্য হইবার জন্য। কতকগুলি প্রজাতি লইয়া একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী করা হইয়াছে। ইহার সহিত অন্য শ্রেণী যুক্ত করিয়া একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শ্রেণী গঠিত হইয়াছে। এইভাবে বৃহৎ শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়া অতি বৃহৎ পর্ব গঠিত হইয়াছে। প্রাণিজগতের বাসিন্দাদের তাই দশটি প্রধান পর্ব বা ফাইলামে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রাণিজগৎকে শ্রেণীবিভাগ করিতে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণের বিচার দরকার। একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর দেহে একটি কোষ থাকে, যেমন প্রোটোজোয়া। অপর গোষ্ঠীর প্রাণীরা অনেক কোষ দিয়া গঠিত, যেমন স্পঞ্জ, হাইড্রা, প্রজাপতি, গোরু ও মানুষ। কতকগুলি প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড থাকে না তাহাদের বলা হয় অমেরুদণ্ডী, যেমন, কেঁচো, আরশোলা, বিছা, শামুক, তারামাছ প্রভৃতি। অন্য উচ্চ পর্বের প্রাণীদের মেরুদণ্ড থাকে তাই তাহাদের মেরুদণ্ডী বলা হয়—মাছ, ব্যাঙ, গিরগিটি, সাপ, পাখী, গোরু, ভেড়া, ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতি।

উপরোক্ত কতকগুলি লক্ষণ ব্যতীত অন্য কতকগুলি লক্ষণও শ্রেণীবিভাগে প্রয়োজন হয়। যথা—

(১) প্রতিসাম্য

(ক) কতকগুলি প্রাণিদেহ অপ্রতিসাম্য। দেহকে ছেদ করিলে তুইটি অংশ সমান হয় না, যথা, প্রোটোজোয়া (অ্যামিবা)। (খ) কতকগুলি প্রাণিদেহ অরীয় প্রতিসাম্য থাকে। কেন্দ্রীয় মধ্যবর্তী অক্ষরেখা, ও মুখের ভিতর দিয়া যে কোন তলের দ্বারা দেহ যদি ছেদ করা যায়।

এইবার প্রাণিজগতের একটি মোটামুটিভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যাক। এইখানে দশটি প্রধান পর্বের উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ—



(১) পর্ব—প্রোটোজোয়া ঃ অ্যামিবা (ক) মনোসিসটিস, (খ) পরজীবী ম্যালেরিয়া প্রভৃতি প্রায় ৩০ হাজার প্রোটোজোয়া প্রজাতি দেখা যায়। ইহাদের দেহ এককোষী এবং এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ ছাড়া ইহাদের দেখা যায় না।

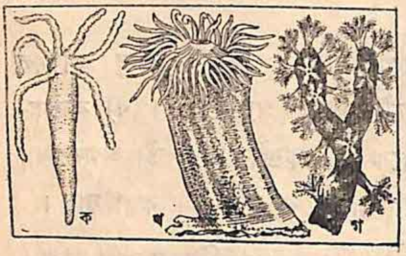
সাধারণ অ্যামিবা জলে বাস করে, মনোসিসটিস্ পরজীবী হইয়া কেঁচোর দেহে থাকে। ম্যালেরিয়া জীবাণু (প্ল্যাসমোডিয়ম) অনেক মেরুদণ্ডীর দেহে পরজীবীর জীবনযাপন করে।

(২) পর্ব—পরিফেরা ঃ ছিদ্রালী প্রাণী। স্পঞ্জের দেহে অরীয় প্রতিসাম্য থাকে। প্রায় পাঁচ হাজার প্রজাতির স্পঞ্জ আছে। ইহারা



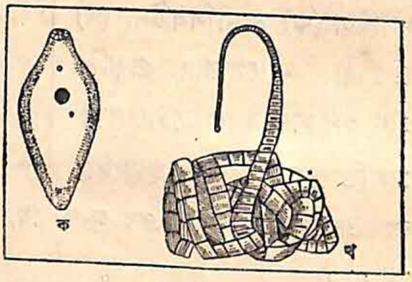
সাধারণত নিশ্চল হইয়া সমুদ্রে বাস করে। ইহাদের দেহে অনেক ছিদ্র থাকে। মিষ্ট জলেও কতকগুলি প্রজাতি বাস করে। স্থলে কোন স্পঞ্জ বাস করে না। একটি স্পঞ্জের দেহে চূণের বা সিলিকার অতি সূক্ষ্ম কঙ্কাল থাকে বা স্পঞ্জিন্ থাকে।

(৩) **পর্ব—সিলেনটেরাটা ঃ** প্রায় ১০ হাজার প্রজাতি আছে। (ক) হাইড্রা (খ) জেলিমাছ (গ) সামুদ্রিক অ্যানিমোন প্রবাল প্রভৃতি প্রায়



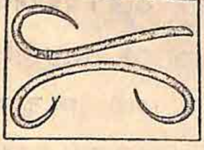
সকল সিলেনটেরাটা সমুদ্রের প্রাণী, কিন্তু হাইড্রা মিষ্টি জলে বাস করে। ইহাদের সকলের দেহে অরীয় প্রতিসাম্য থাকে। দেহদ্বিস্তর বিশিষ্ট। পৌষ্টিক নালীতে মুখ থাকে কিন্তু পায়ু থাকে না। মুখের চারিধারে কর্শিকা থাকে।

(৪) **পর্ব—প্ল্যাটিহেল-মিনথেস্ ঃ** প্রায় ১০০০০ প্রজাতি আছে। উদাহরণ ঃ লিভার ফ্লুক (ক) টেপওয়ারম্ (খ) প্রভৃতি। ইহাদের দেহ চ্যাপটা ফিতার ন্যায়। দেহে দ্বিপার্শ্ব প্রতিসাম্য দেখা



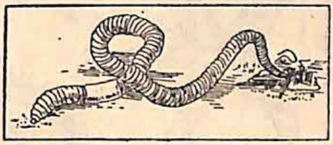
যায়। পৌষ্টিক নালীতে মুখ থাকে, পায়ু থাকে না। ইহারা অনেকে প্রাণিদেহে পরজীবী হইয়া বাস করে।

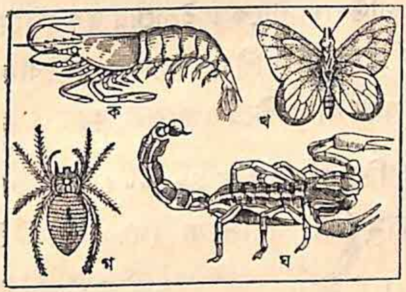
(৫) **পর্ব—নিমেটহেলমিনথেস্ ঃ** প্রায় ১২০০০ প্রজাতি আছে। উদাহরণ ঃ সূতাকৃমি, মানুষের দেহের কেঁচো কৃমি ও হুক্ওয়ারম্।



ইহাদের দেহ সরু নলের আকৃতি দীর্ঘ ও দ্বিপার্শ্ব প্রতিসাম্য থাকে। দেহের দুই দিক সরু হইয়া যায়। পৌষ্টিক নালিতে মুখ ও পায়ু থাকে। ইহারা অনেকে পরজীবী হইয়া মানুষ ও অন্য প্রাণীর দেহে বাস করে।

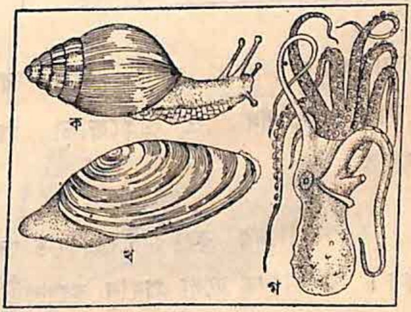
(৬) **পর্ব—অ্যানিলিডা :** প্রায় ৮৭০০ প্রজাতি আছে। উদাহরণ : জোঁক, কেঁচো, নেরিস প্রভৃতি। দেহে দ্বিপার্শ্ব প্রতিসাম্য থাকে। ইহাদের শরীর নরম, লম্বা ও ইহাতে খণ্ডীকরণ দেখা যায়। দেহ-প্রাচীর ও পৌষ্টিক নালীর মধ্যে সিলোম বলিয়া একটি গহ্বর থাকে। কোন প্রাণী, যেমন, কেঁচো মাটির নীচে থাকে। জোঁক পরজীবী হইয়া মানুষ বা অন্য প্রাণীর রক্ত খায়। নেরিস সমুদ্রে থাকে।



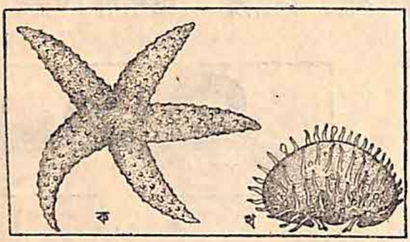


(৭) **পর্ব—আরথ্রোপোডা :** প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৯১,৬০০। উদাহরণ : আরশোলা, প্রজাপতি, কেন্নো, বিছা, মাকড়সা, চিংড়িমাছ, কাঁকড়া প্রভৃতি। ইহাদের দেহে দ্বিপার্শ্ব প্রতিসাম্য থাকে। দেহে খণ্ডীকরণ লক্ষ্য করা যায়। দেহের কোমল অংশটির বাহিরে একটি কাইটিনে গঠিত শক্ত আবরণ থাকে। দেহের প্রতিটি খণ্ডে থাকে একজোড়া উপাঙ্গ—ইহারা সন্ধিবিশিষ্ট।

(৮) **পর্ব—মোলাস্ক :** প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৪৫,০০০। উদাহরণ : শামুক (ক), ঝিনুক (খ), মুক্তা ঝিনুক, অক্টোপাস সিপিয়া (গ) প্রভৃতি। ইহাদের দেহে খণ্ডীকরণ নাই ও উপাঙ্গহীন। দেহের কোমল অংশটি চুনে নির্মিত একটি খোলকে ঢাকা। চলিবার জন্য একটি মাংসল পা থাকে। দেহের ভিতরে কোমল

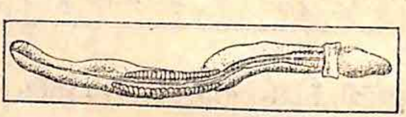


অংশকে ম্যানট্‌ল নামে একটি পরদা ঢাকিয়া রাখে। অনেক মোলাস্ক সমুদ্রে থাকে, কিছু থাকে মিঠা জলে, অনেকে আবার স্থলের প্রাণী।

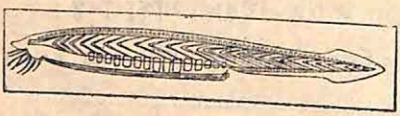


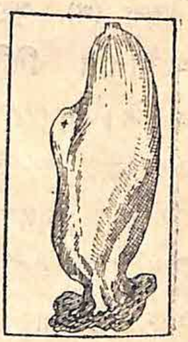
(৯) **পর্ব—একাইনোডারমাটা:** প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৫৫০০। উদাহরণ: তারামাছ (ক), সি আর্‌চিন (খ), সি কিউকামবার ও সি লিলি। ইহাদের দেহে অরীয় প্রতিসাম্য থাকে। ইহাদের ত্বক কাঁটায় ভরা থাকে। ইহারা সকলেই সমুদ্রের প্রাণী। অনেকে টিউবফিট নামে কতকগুলি বিচিত্র অঙ্গের দ্বারা ধীরে ধীরে চলাফেরা করে।

(১০) **পর্ব—কর্ডাটা:** প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৪০০০০। উদাহরণ: ব্যালানোগ্লসাস্ (ক), অ্যাম্ফিঅক্সাস্ (খ), অ্যাসিডয়া (গ) ও মেরুদণ্ডী প্রাণী। ইহাদের সাধারণত দ্বিপার্শ্ব প্রতিসাম্য থাকে। দেহে সিলোমও দেখা যায়।



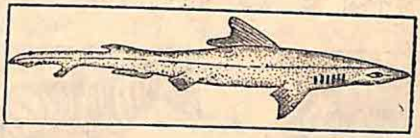
অ্যাম্ফিঅক্সাস্, অ্যাসিডিয়া প্রভৃতি নীচু স্তরের কর্ডাটা প্রাণীর দেহে আজীবন নোটোকর্ড বলিয়া একটি রড্ থাকে। মেরুদণ্ডীর থাকে একটি মাথা, গলা, ধড় ও লেজ। দুইটি উপাঙ্গ, যথা, একজোড়া অগ্রপদ ও একজোড়া পশ্চাৎপদ থাকে।



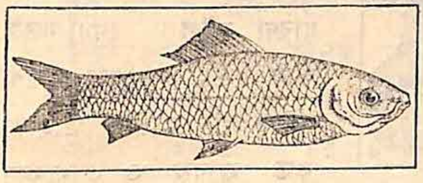


মেরুদণ্ডীদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তাহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটির বর্ণনা করা হইতেছে।

(১) **কণ্ড্রিকৃথিস্**—দেহ প্লাকয়েড আঁশ দ্বারা আবৃত, মুখছিদ্র অঙ্কীয়-দেশে, তরুণাস্থি, জোড়া এবং বিজোড় পাখনা থাকে। যেমন—হাঙ্গর।

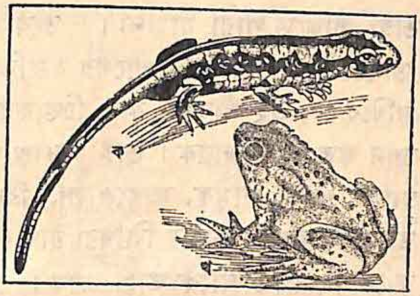


(২) **অষ্টিকৃথিস**—দেহ সাইক্লয়েড বা টিনয়েড আঁশ দ্বারা আবৃত।



দেহের অগ্রভাগে মুখছিদ্র, অস্থিময় কঙ্কাল; জোড় এবং বিজোড় পাখনা থাকে, যেমন—রুইমাছ।

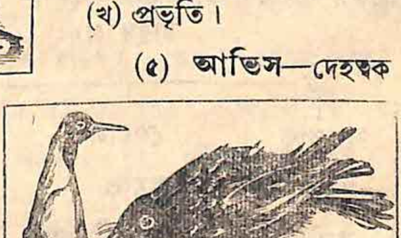
(৩) **অ্যাম্ফিবিয়া**—গাত্রত্বক নগ্ন ও ভিজা, সাধারণত দুই জোড়া পা, যেমন—স্যালামাণ্ডার (ক), কোলাব্যাঙ (খ) প্রভৃতি।



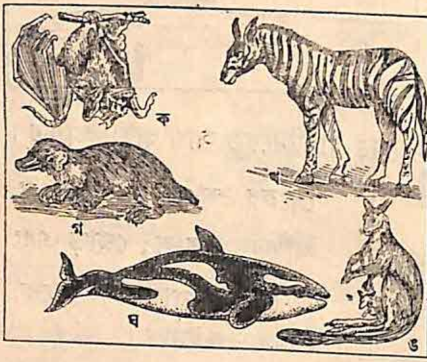


(৪) **রেপটিলিয়া**—দেহ আঁশ দ্বারা আবৃত, সাধারণত দুইজোড়া পা, যেমন টিকটিকি (ক), কচ্ছপ (খ) প্রভৃতি।

(৫) **আভিস**—দেহত্বক পালক দ্বারা আবৃত, একজোড়া পদ ও একজোড়া ডানা, দন্তহীন চোয়াল ও চঞ্চু অগ্রভাগে থাকে, যেমন, পেঙ্গুইন(ক), কাক (খ) প্রভৃতি।



(৬) **ম্যামালিয়া**—দেহত্বক লোমদ্বারা আবৃত, চোয়ালে দন্ত, কর্ণছত্র ও স্তন্য থাকে, যেমন বাদুড়(ক), জেব্রা(খ), প্লাটিপাস(গ), তিমি (ঘ), ক্যাঙ্গারু (ঙ), প্রভৃতি।



এখন তোমাদের এই সকল প্রাণীর সম্বন্ধে কিছু ধারণা হইল। বর্ণনা যতই ভাল হউক না কেন পুস্তক হইতে পাঠ করিলে তাহারা কত জীবন্ত ও প্রাণচঞ্চল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তবে এই সামান্য বর্ণনার জ্ঞান লইয়া তোমরা তোমাদের আশেপাশের প্রকৃতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবে যে, এই জীবজন্তু কত চিত্তাকর্ষক ও তাহাদের দেহের বিষয়ের জ্ঞান কত আনন্দদায়ক। তাই অত্যন্ত আগ্রহচিত্তে অতি পরিচিত গোরু, ছাগল, পাখী, শামুক, আরশোলা, বিছা, মাকড়সা, কেঁচো প্রভৃতি দেখ, তাহাদের লক্ষণ খাতায় লিখিয়া রাখ। যদি ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণী জারে সংরক্ষিত থাকে তাহা দেখ। চার্টে প্রোটোজোয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণী দেখ। (এই বিষয় অনেক তথ্য পুস্তিকার শেষে পাওয়া যাইবে)

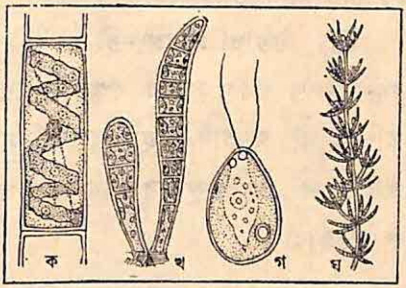
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেকটি উদ্ভিদের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। এই সকল বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য রহিয়াছে। সমগ্র উদ্ভিদ জগৎকে নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে ভাগ করিয়া দেখান হইতেছে

উদ্ভিদ জগৎ

- অপুষ্পক
  - সমাঙ্গদেহী
    - শেবাল
    - ছত্রাক
    - ব্যাক্‌টিরিয়া
    - লাইকেন
  - ব্রাইওফাইটা
  - টেরিডোফাইটা
- সপুষ্পক
  - ব্যক্তবীজী
  - গুপ্তবীজী
    - একবীজপত্রী
    - দ্বিবীজপত্রী

আমাদের চারিদিকে কোটি কোটি উদ্ভিদ রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ উদ্ভিদই সবুজ বর্ণের। এই সকল সবুজ বর্ণের উদ্ভিদের অধিকাংশই ফুল ও বীজ বহন করে। ইহাদের **সপুষ্পক উদ্ভিদ** বা সবীজ উদ্ভিদ বলা হয়। ইহা ছাড়াও আরো অনেক সবুজ বর্ণের এবং অন্য বর্ণের উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা ফুল, ফল বা বীজ বহন করে না। ইহাদের **অপুষ্পক** বা অবীজ উদ্ভিদ বলা হয়। অনেক অপুষ্পক সবুজ এবং অসবুজ উদ্ভিদের দেহ মূল, কাণ্ড বা পাতার দ্বারা গঠিত হয় না। ইহাদের **সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ** বলে। ইহাদের দেহ এককোষী বা বহুকোষী হয়।

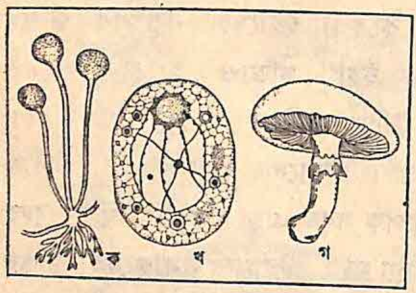
শৈবাল—তোমরা পুকুরের বা জলা জায়গার উপর সবুজ বর্ণের আস্তরণ দেখিয়াছ। আস্তরণসহ কিছুটা জল হ্যাণ্ডলেন্সের সাহায্যে নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে, বিন্দুর মত বস্তু নড়া-চড়া করিতেছে। ইহার মধ্যে লম্বা-লম্বা সূতার ন্যায় সবুজ বর্ণের বস্তু রহিয়াছে। ইহারা শৈবাল। নিম্নলিখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।



(১) ইহারা সমাঙ্গদেহী। (২) ইহারা সাধারণত ভিজা বা জলা জায়গা, পুকুর বা নদীতে থাকে। (৩) ইহাদের দেহে সবুজ কণিকা থাকায় ইহা সবুজ বর্ণের হয়। (৪) সবুজ কণিকা ছাড়াও অন্যান্য বর্ণের কণিকা থাকিতে পারে। (৫) ইহারা স্বভোজী।

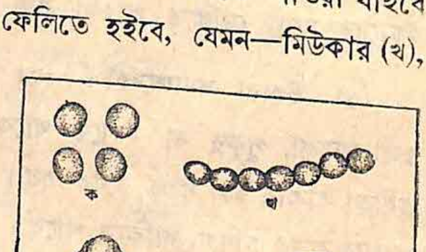
এই সকল চরিত্র যে সকল উদ্ভিদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহাদের শৈবাল শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে হইবে, যেমন—স্পাইরোগাইরা, (ক) ভলভক্স, কারা (খ) প্রভৃতি।

ছত্রাক—তোমরা বর্ষাকালে মাঠে গোবরে বা পচা কাঠে শ্বেত বর্ণের বা ক্রীম বর্ণের ছোট ছোট ছাতার ন্যায় বস্তু দেখিয়াছ। ইহাদের ব্যাঙ-এর ছাতা বলা হয়। তোমরা হয়ত পচা পাঁউরুটি ও ভিজা জুতার উপর তূলার মত আস্তরণ দেখিয়াছ। ইহারা নানা বর্ণের হয়। ইহাদের চল্‌তি কথায় ভেপ্‌নো বলা হয়। গম গাছের কাণ্ডে বা পাতায় খয়েরী বর্ণের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই ছত্রাক। নিম্ন-লিখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণত আণুবীক্ষণিক।



(১) ইহারা সমাঙ্গদেহী। (২) ইহারা সাধারণত মৃত বা পচা বস্তুর উপর অথবা সজীব বস্তুর উপরে বা অভ্যন্তরে জন্মায়। (৩) সবুজ কণিকা না থাকায় ইহাদের বর্ণ সবুজ নহে। (৪) ইহাদের দেহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সূতার ন্যায় অংশ দ্বারা গঠিত। (৫) ইহারা পরজীবী বা মৃতজীবী।

এই সকল চরিত্র যে সকল উদ্ভিদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহাদের ছত্রাক শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে হইবে, যেমন—মিউকার (খ), ইষ্ট (ক), স্যালিওটা (গ) প্রভৃতি।



ব্যাক্টেরিয়া—তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছ যে, বাসি তরকারী ব' দুধ টক হইয়া যায়। ইহার জন্য দায়ী আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ, যাহার নাম ব্যাক্টেরিয়া। ইহাদের সকল রকম পরিবেশেই

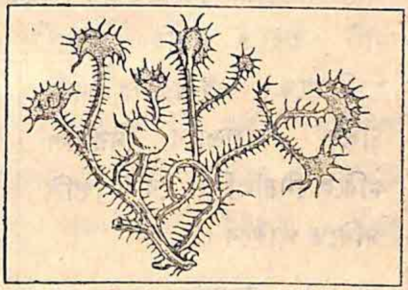
পাওয়া যায়। যথা—জলে, স্থলে ও বাতাসে। সজীব বা অজীব, সকল বস্তুতেই ইহারা থাকে। তোমরা যদি ময়লা জল বা তোমাদের দাঁতের ময়লা লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নিরীক্ষণ কর তাহা হইলে হাজার হাজার ব্যাক্টেরিয়া দেখিতে পাইবে।

নিম্নলিখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ

(১) এককোষী ও আণুবীক্ষণিক। (২) সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ। (৩) সবুজ কণিকা থাকে না। (৪) বিভিন্ন রকমের আকৃতি হয় যথা, কমা, গোল, পেচালো প্রভৃতি। (৫) পরজীবী বা মৃতজীবী।

এই সকল চরিত্র যে সকল উদ্ভিদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহাদের ব্যাক্টেরিয়া শ্রেণীতে ফেলিতে হইবে। যেমন, ডিপ্লোকক্কাস, স্ট্রেপটোকক্কাস প্রভৃতি।

লাইকেন—গ্রামের রাস্তার ধারে অবস্থিত অনেক উদ্ভিদের কাণ্ডে ধূসর সবুজ বর্ণের বস্তু দেখা যায়। একটি ছুরির সাহায্যে এই বস্তু চাঁচিয়া লইয়া নিরীক্ষণ করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাইবে।

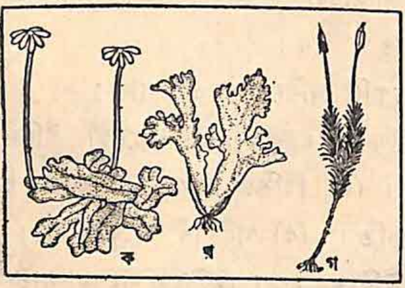


(১) অসমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ। (২) ইহা ছত্রাক ও শৈবালের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। (৩) ধূসর বর্ণের হয়। (৪) পাথর, গাছের গুঁড়ি বা মৃত উদ্ভিদের উপর জন্মায়। (৫) ইহারা সাধারণত চ্যাপটা পাতার ন্যায় হয়। (৬) শৈবালের অংশ ছত্রাকের দ্বারা ঢাকা থাকে।

উপরোক্ত চরিত্রগুলি যে সকল উদ্ভিদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের লাইকেন বলা হয়। যেমন—এ্যাসকোলাইকেন।

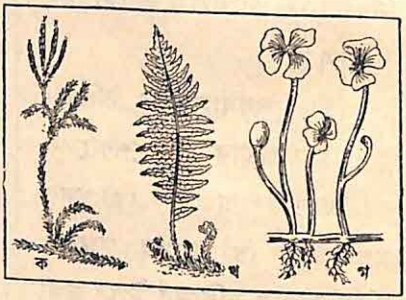
ব্রাইওফাইটা—তোমরা বর্ষাকালে ভিজা দেওয়ালে, পাথরে ও পুকুর বা নদীর পাড়ে সবুজ ভেলভেটের আবরণ দেখিয়াছ। ইহাদের ভালভাবে নিরীক্ষণ করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাইবে।

(১) ইহারা সমাঙ্গদেহী অথবা দেহটি কাণ্ড ও পাতার দ্বারা গঠিত। (২) উভয়ক্ষেত্রেই মূলের ন্যায় সরু সরু সূতার মত বস্তু দেখা যায়, যাহাদের রাই-জয়েড বলা হয়। (৩) ইহাদের দেহে সবুজ কণিকা থাকার জন্য দেহ সবুজ হয়।



এই সকল চরিত্র যে সকল উদ্ভিদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের ব্রাইওফাইটা শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে হয়। যেমন—মারক্যানসিয়া (ক), পলিট্রিকাম (গ) প্রভৃতি।

টেরিডোফাইটা—তোমরা বাগানে, জঙ্গলে বা পর্বতের গাত্রে নানা আকারের সুন্দর সুন্দর পাতা দেখিতে পাও। পাতাগুলি যেন মাটি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। এই ধরনের একটি উদ্ভিদ ভালভাবে নিরীক্ষণ করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাইবে।

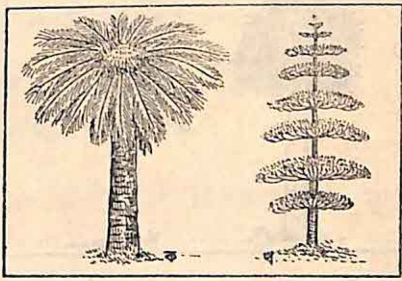


(১) ইহাদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতার দ্বারা গঠিত।

(২) পাতাগুলি সাধারণত যৌগিক পত্র। (৩) কাণ্ড সাধারণত মৃদ্গত। (৪) সবুজ বর্ণের হয়।

এই সকল চরিত্র যে সকল উদ্ভিদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের টেরিডোফাইটা শ্রেণীর মধ্যে ফেলা হয়, যেমন লাইকো-পোডিয়াম (ক), মার্সিলিয়া (গ), ফার্ণ (খ) প্রভৃতি।

ব্যক্তজীবী—তোমরা পাহাড়ী অঞ্চলে এমন কতকগুলি সপুষ্পক উদ্ভিদ দেখিতে পাইবে যাহারা সাধারণত অধিকাংশ সপুষ্পক উদ্ভিদ হইতে পৃথক। ইহাদের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য খুব বেশী। ইহাদের ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।



(১) ইহাদের ফুলগুলি সরল এবং একলিঙ্গ হয়। (২) সাধারণত ফুলগুলি গুচ্ছাকারে থাকে। (৩) ফুলে বৃতি বা দলমণ্ডল নাই। (৪) ডিম্বাশয় না থাকায় ফল হয় না। (৫) বীজ ঢাকা থাকে না।

এই সকল বৈশিষ্ট্য যে সকল উদ্ভিদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের ব্যক্তবীজী শ্রেণীর মধ্যে ফেলা হয়, যেমন—সাইকাস (ক), পাইন (খ) প্রভৃতি।

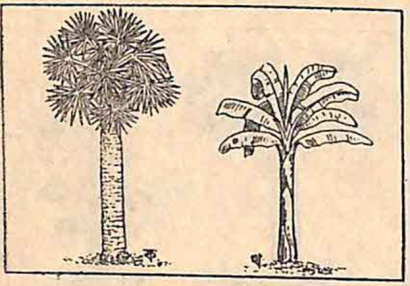
গুপ্তবীজী—তোমাদের বাড়ীর আশেপাশে যে সকল সপুষ্পক উদ্ভিদ দেখিতে পাও তাহাদের ভালভাবে লক্ষ্য করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাইবে। পৃথিবীর অধিকাংশ উদ্ভিদ গুপ্তবীজী।

(১) ইহাদের ফুল সাধারণত চারিটি স্তবকের দ্বারা গঠিত। (২) ডিম্বাশয় ফলে পরিণত হয়। (৩) বীজ ফলের মধ্যে নিহিত থাকে।

এই সকল চরিত্র যে সকল উদ্ভিদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের গুপ্তবীজী শ্রেণীর মধ্যে ফেলা হয়। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত।

(ক) **একবীজপত্রী উদ্ভিদ**—নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখিয়া এই ধরনের উদ্ভিদকে চিনিতে হয়।

(১) বীজে একটিমাত্র বীজপত্র থাকে। (২) সাধারণত পাতা সমাঙ্কপৃষ্ঠ হয়। (৩) সাধারণত পাতায় সমান্তরাল শিরাবিন্যাস হয়।

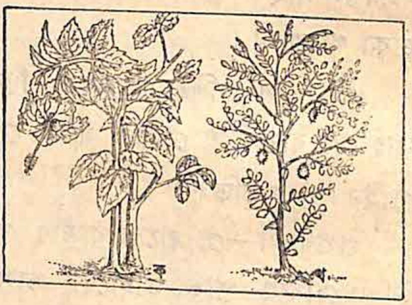


(৪) প্রধান মূল থাকে না, কাণ্ডের গোড়া হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয়। (৫) পত্রমূল সাধারণত চওড়া হয়। (৬) সাধারণত ফুল ত্রিঅংশক হয়।

উদাহরণ ঃ ধান, তাল (ক), কলাগাছ (খ) প্রভৃতি।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ—নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিয়া এই সকল উদ্ভিদ চিনিতে হয় ঃ

(১) বীজে দুইটি বীজ-পত্র থাকে। (২) সাধারণত পাতা বিষমপৃষ্ঠ হয়। (৩) সাধারণত পাতায় জালিকা শিরাবিন্যাস হয়। (৪) সাধারণত প্রধান মূল বিদ্যমান। (৫) ফুল সাধারণত পঞ্চাংশক হয়।



উদাহরণ ঃ জবা (ক), বট, আম, সরিষা প্রভৃতি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের বহিরাকৃতি ও তাহাদের পরিবর্তিত অংশ

একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের দেহ দুইটি অংশে বিভক্ত। যথা—মূল ও বিটপ। মূল মাটির নিম্নে থাকে এবং বিটপ সাধারণত মাটির উপরে থাকে। বিটপ আবার নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা তৈয়ারী হয়। যথা—কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল ও বীজ।

মুল—ইহা বর্ণহীন এবং দুই প্রকারের হয়।

(১) **স্থানিক মূল**—যে সকল উদ্ভিদের ভ্রূণমূল বর্ধিত হইয়া সোজাসুজি মাটিতে প্রবেশ করে তাহাকে স্থানিক মূল বা প্রধান মূল বলা হয়।

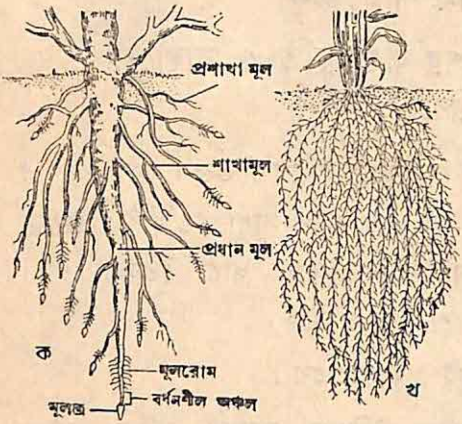
(২) **অস্থানিক মূল**—যে সকল উদ্ভিদের ভ্রূণমূল শুরুতেই নষ্ট হইয়া যায় এবং কাণ্ডের গোড়া হইতে সুতার ন্যায় মূলগুচ্ছ হিসাবে বাহির হয় তাহাকে অস্থানিক মূল বা গুচ্ছমূল বলা হয়, যেমন, ধান। (চিত্র-খ) অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে শাখা-প্রশাখা ও পাতা হইতে অস্থানিক মূল সৃষ্টি হইতে পারে, যেমন, বাঁশ, পাথরকুচি প্রভৃতি।

প্রধান মূলের বিভিন্ন অংশ—ইহা চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত। (চিত্র-ক)

(১) **মূলত্র অঞ্চল**—মূলের অগ্রভাগ মূলত্র নামক একটি আবরণের দ্বারা ঢাকা থাকে। এই অগ্রভাগকে মূলত্র অঞ্চল বলা হয়।

(২) **বর্ধনশীল অঞ্চল**—মূলত্রের পিছনের কয়েক মিঃ মিঃ অঞ্চলকে বর্ধনশীল অঞ্চল বলা হয়। এই অঞ্চল কোষবিভাজনের জন্য দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়।

(৩) **মূলরোম অঞ্চল**—উপরোক্ত অংশের পিছনে ইহা অবস্থিত। এই অঞ্চলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককোষী রোম বাহির হয়।



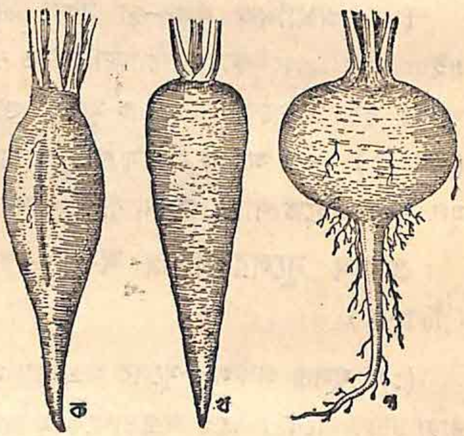
ক—প্রধান মূল ও বিভিন্ন অংশ
খ—অস্থানিক মূল (গুচ্ছ মূল)

(৪) **স্থায়ী অঞ্চল**—মূলরোম অঞ্চলের পিছনের সমগ্র অংশটিকে স্থায়ী অঞ্চল বলা হয়। ইহা হইতে শাখা-প্রশাখা বাহির হয়।

পরিবর্তিত মূল—মূলের সাধারণ কাজ ছাড়াও কোন কোন উদ্ভিদের মূলের আকার বিশেষ ধরনের কাজের জন্য পরিবর্তিত হয়।

(১) **পরিবর্তিত স্থানিক মূল**—অত্যধিক খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য কোন কোন উদ্ভিদের মূল আকারে স্থূল হয়। আকার অনুযায়ী ইহাদের শ্রেণী-বিন্যাস করা হয়।

(ক) মূলকাকার—প্রধান মূলের দুইপ্রান্ত সরু এবং মধ্যস্থান স্থূল হয়, যেমন, মূলা।



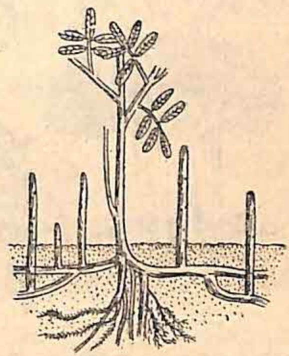
ক—মূলকাকার ; খ—শাঙ্কব ;
গ—শালগমাকার

(খ) **শাঙ্কব**—প্রধান মূলের উপরাংশ স্থূল এবং নিম্নাংশ ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়, যেমন, গাজর।

(গ) **শালগমাকার**—প্রধান মূলের উপরাংশ সর্বাপেক্ষা স্থূল ও গোলাকার এবং নিম্নাংশ হঠাৎ সরু হইয়া যায়, যেমন—শালগম।

(ঘ) **কন্দাল**—প্রধান মূল স্থূল হইলেও নির্দিষ্ট কোন আকার থাকে না, যেমন—কৃষ্ণকলি।

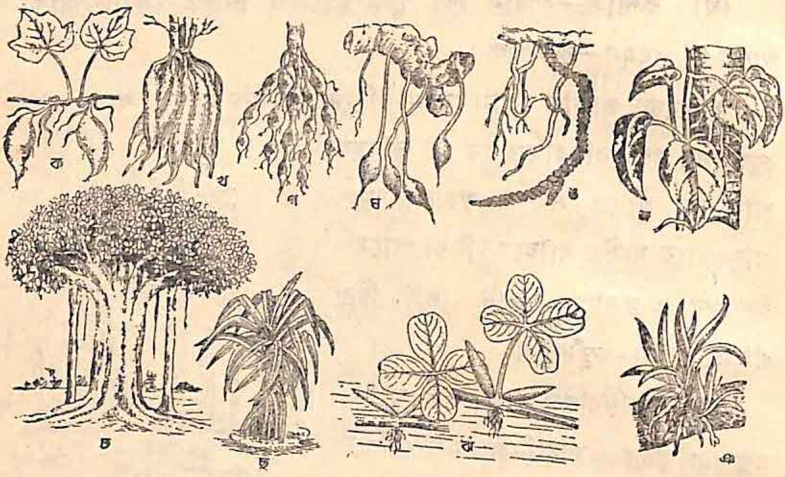
খাদ্যসঞ্চয় ছাড়াও কোন কোন উদ্ভিদের স্থানিক মূলের শাখা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য পরিবর্তিত হয়। ভূনিম্নস্থ শাখামূল হইতে সরু ও সূচালো মূল, খাড়াভাবে মাটির বাহিরে চলিয়া আসে। ইহাদের অগ্রভাগে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, যেমন—সুঁদরী।



(২) **পরিবর্তিত অস্থানিক মূল**—বহু প্রকারের অস্থানিক মূল দেখিতে পাওয়া যায়। (18 পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)

(ক) **কন্দাল**—খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য ইহারা স্থূল হইলেও ইহাদের নির্দিষ্ট কোন আকার থাকে না, যেমন—রাঙ্গাআলু। (চিত্র-ক) (খ) **গুচ্ছিত**—কাণ্ডের গোড়া হইতে নির্গত অনেকগুলি অস্থানিক মূল খাদ্যসঞ্চয়ের জন্য স্থূল হইয়া যায়, যেমন—শতমূলী। (চিত্র-খ) (গ) **অর্বুদযুক্ত**—অস্থানিক মূলের প্রান্তদেশ খাদ্যসঞ্চয়ের জন্য স্ফীত হইয়া যায়, যেমন—আমআদা। (চিত্র-গ) (ঘ) **মালাকৃতি**—খাদ্যসঞ্চয়ের জন্য অস্থানিক মূল ক্রমান্বয়ে সরু ও মোটা হয়, যেমন—কাঁকরোল। (চিত্র-ঘ) (ঙ) **বলয়ী**—খাদ্যসঞ্চয়ের জন্য অস্থানিক মূল স্থূল হইয়া চাকৃতির ন্যায় পর পর সাজান থাকে, যেমন—ইপিকাক। (চিত্র-ঙ) (চ) **পরাশ্রয়ী মূল**—বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প গ্রহণের জন্য অস্থানিক মূল কিছুটা স্থূল, নরম ও সবুজ বর্ণের হয় এবং ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যেমন—রাসনা। (চিত্র-ঞ) (ছ) **দৃঢ়সংলগ্না**—অস্থানিক মূল অপর উদ্ভিদের দেহকে আঁকড়াইয়া ধরিতে সাহায্য করে, যেমন—গজপিপুল।

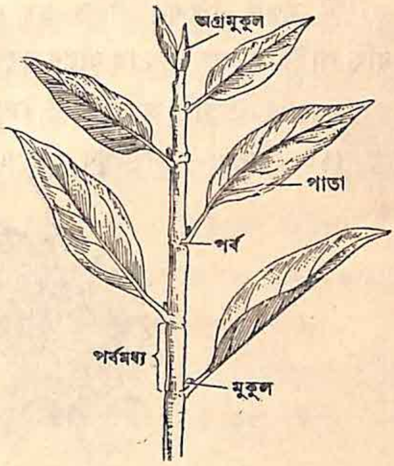
(চিত্র-জ) (জ) **আত্তীকরণ**—খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য অস্থানিক মূল লম্বা এবং সবুজ হয়, যেমন—গুলঞ্চ। (ঝ) **ভাসমান মূল**—



শ্বাস-প্রশ্বাস ও ভাসিবার উদ্দেশ্যে জলজ বায়ু সঞ্চয়ের জন্য অস্থানিক মূল নরম এবং ক্ষুদ্র থলির মত হয়। যেমন—কেশরদাম। (চিত্র-ঝ) (ঞ) **চোষ মূল**—খাদ্য শোষণের জন্য অস্থানিক মূল সরু হইয়া আবার উদ্ভিদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, যেমন—স্বর্ণলতা। (ট) **ঝুরি মূল**—শাখা-প্রশাখার ভার বহন করিবার জন্য অস্থানিক মূল খাড়াভাবে মাটিতে নামিয়া আসে এবং ক্রমশঃ স্থূল হইয়া স্তম্ভের আকার ধারণ করে, যেমন—বট। (চিত্র-চ) (ঠ) **ঠেস মূল**—প্রধান কাণ্ডের ভার বহন করিবার জন্য অস্থানিক মূল প্রধান কাণ্ড হইতে বাহির হইয়া তির্যকভাবে মাটিতে প্রবেশ করে, যেমন—কেয়া। (চিত্র-ছ) (ড) **আরোহী**—দুর্বলশ্রেণীর কাণ্ডকে অস্থানিক মূল উপরে উঠিতে সাহায্য করে, যেমন—পান।

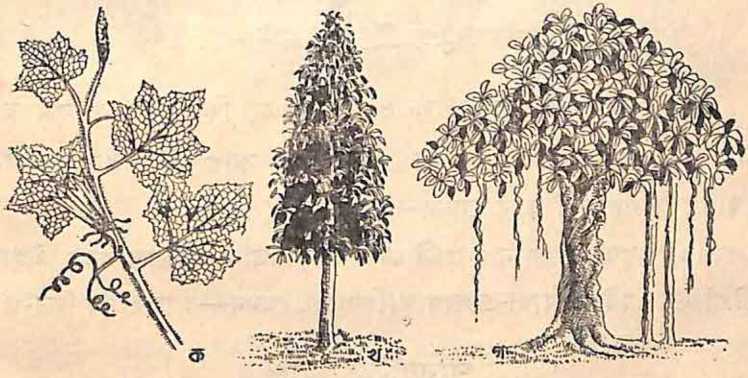
কাণ্ড—ইহা বিটপের অংশ। ইহা শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফল বহন করে। কাণ্ডের যেস্থান হইতে পাতা বাহির হয় তাহাকে পর্ব এবং দুইটি পর্বের মধ্যবর্তী অংশকে পর্বমধ্য বলে;

প্রত্যেকটি কাণ্ডের অগ্রভাগে শীর্ষমুকুল এবং পাতার কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে। পাতার কক্ষ হইতে কাণ্ডের ন্যায় শাখা-প্রশাখা বাহির হয়।



কাণ্ড ও ইহার বিভিন্ন অংশ

যে সকল উদ্ভিদের কাণ্ড বেশ শক্ত হয় তাহাকে সবল কাণ্ড বলে, যেমন—আম। অনেক উদ্ভিদের কাণ্ড নরম হয়। তাহারা খাড়াভাবে দাঁড়াইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে যাহারা মাটিতে লতাইয়া থাকে তাহাদের ব্রততী বলা হয়, যেমন—ঘাস। আবার যাহারা কাহাকেও অবলম্বন করিয়া উঠে তাহাদের রোহিণী বলা হয়, যেমন—শিম, কুমড়া। (চিত্র-ক)।



সবল কাণ্ডের বৃদ্ধি অনুসারে ও তাহার শাখা-প্রশাখা বিন্যাসের জন্য উদ্ভিদের আকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়।

(১) **শাঙ্কবাকার**—প্রধান কাণ্ডটি লম্বায় বৃদ্ধি পায় এবং উহার শাখাগুলি নীচের দিক হইতে উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে ছোট হইয়া

যায়, যেমন—পাইন। (চিত্র-খ)। (২) **গম্বুজাকার**—প্রধান কাণ্ডটি লম্বায় বিশেষ বর্ধিত হয় না এবং উহার শাখা-প্রশাখা বেশি বৃদ্ধি পাইয়া গম্বুজ আকার ধারণ করে, যেমন—বট। (চিত্র-গ)

কাণ্ডের প্রকৃতি অনুযায়ী উদ্ভিদ্‌দের তিনভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) **বীরুৎ**—কাণ্ড খুব ক্ষুদ্র ও নরম হয়, যেমন—ধান। (চিত্র-ক)



(২) **গুল্ম**—কাণ্ড বেশ শক্ত ও কাষ্ঠময় হয় কিন্তু বিশেষ বড় হয় না। শাখা-প্রশাখাগুলি মাটির কিছু উপরে কাণ্ড হইতে বাহির হইয়া ছোট ঝোপের সৃষ্টি করে, যেমন—গন্ধরাজ। (চিত্র-খ)

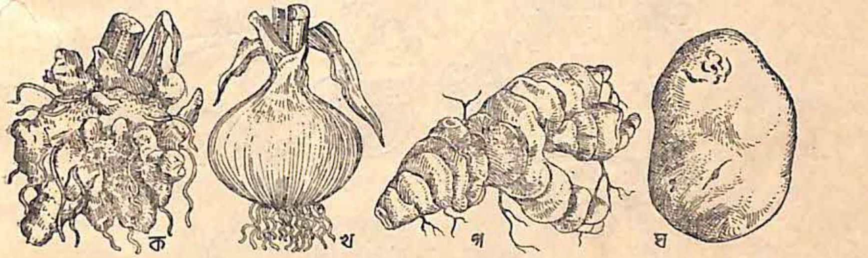
(৩) **বৃক্ষ**—প্রধান কাণ্ডটি বেশ শক্ত, লম্বা ও কাষ্ঠময় হয়। ইহার উপরিভাগ হইতে শাখা-প্রশাখা বাহির হয়, যেমন—আম। (চিত্র-গ)

পরিবর্তিত কাণ্ড

বিশেষ ধরনের কাজের জন্য কাণ্ড পরিবর্তিত হইয়া বিশেষ আকার ধারণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার আকার এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, তাহাকে আর কাণ্ড বলিয়া চেনা যায় না। পরিবর্তিত কাণ্ড-গুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) **মৃদ্‌গত কাণ্ড**—এই প্রকার পরিবর্তন তিনটি কারণের জন্য হয়। যথা, ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করা, বৎসরের পর বৎসর বাঁচিয়া থাকা এবং বংশ বিস্তার করা। প্রতিকূল পরিবেশে মাটির উপরের বিটপ অংশ মরিয়া যায়। কিন্তু মৃদ্‌গত কাণ্ড বাঁচিয়া থাকে। পরবর্তী ঋতুতে অনুকূল পরিবেশে ভূনিম্নস্থ কাণ্ড হইতে উপরের বিটপ অংশ বাহির হয়। ইহারা মূলের ন্যায় দেখিতে হইলেও কম-বেশী কাণ্ডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে। ইহারা বিভিন্ন প্রকারের হয়।

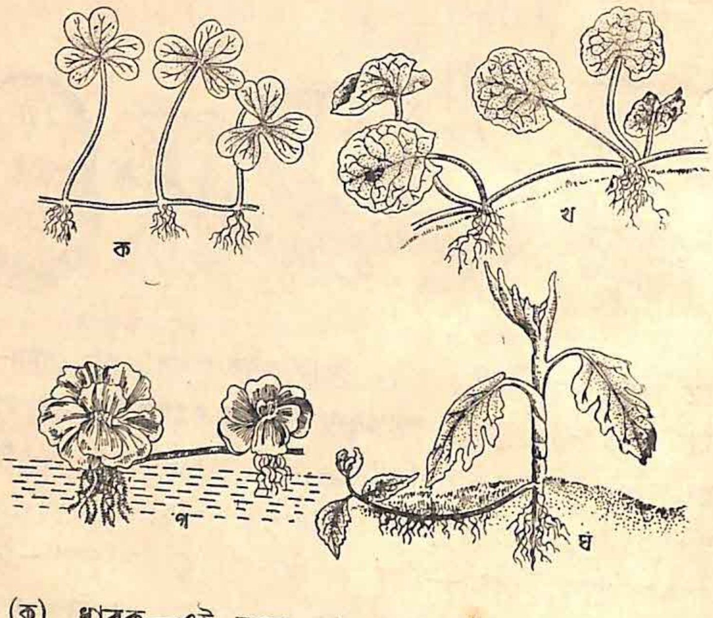
(ক) **গ্রন্থিকাণ্ড**—ইহারা মাটির নীচে সমান্তরালভাবে বর্ধিত হয়। ইহাদের পর্ব, পর্বমধ্য, শল্কপত্র, কাক্ষিক ও অগ্রমুকুল থাকে। পর্ব



হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয়। ইহারা স্ফীত ও রসাল হয়, যেমন—আদা। (চিত্র-গ) (খ) **স্ফীতকন্দ**—মৃদ্‌গত কাণ্ডগুলির কেবলমাত্র অগ্রভাগ এই প্রকার কাণ্ডে পরিবর্তিত হয়। ইহারা ডিম্বাকৃতি ধারণ করে। ইহাদের গাত্রে পত্রক্ষত দেখা যায়। কাক্ষিক মুকুল ও অগ্রমুকুল থাকে, যেমন—আলু। (চিত্র-খ) (গ) **গুড়িকন্দ**—ইহা একটি পরিবর্তিত পর্বমধ্য। ইহাদের গাত্র হইতে স্থানিক মুকুল ও অস্থানিক মূল বাহির হয়। ইহারা অত্যধিক স্থূল ও গোলাকার হয়। অস্থানিক মুকুলগুলিও ঈষৎ স্থূল হয়, যেমন—ওল। (চিত্র-ক) (ঘ) **কন্দ**—আকারে ইহারা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং অবতল চাকৃতির আকার ধারণ করে। পর্ব হইতে স্থূল ও রসাল পাতা বাহির হয়। কাক্ষিক মুকুল হইতে আপত্য কন্দের সৃষ্টি হয়। বাহিরের দিক

শল্কপত্রের দ্বারা ঢাকা থাকে। অগ্রমুকুল হইতে মাটির উপরে বিটপ সৃষ্টি করে, যেমন—পিঁয়াজ। (চিত্র-খ)

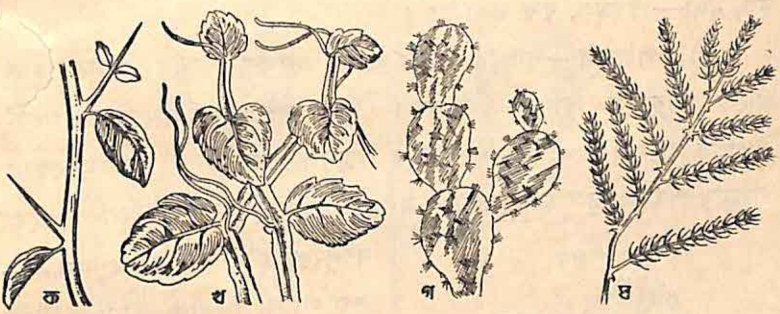
(২) **অর্ধবায়ব কাণ্ড**—দ্রুত বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে বীরুৎ শ্রেণীর কোন কোন উদ্ভিদের দুর্বল কাণ্ড পরিবর্তিত হয়। ইহাদের শাখাগুলি কাণ্ডের গোড়া হইতে উৎপন্ন হইয়া জল অথবা মাটির উপরিভাগে থাকে অথবা মাটির ঠিক নিম্নে থাকে। ইহাদের পর্ব হইতে অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। পরবর্তীকালে এক একটি অপত্য উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। ইহাদের কয়েক প্রকারে বিভক্ত করা যায়।



(ক) **ধারক**—এই রকম কাণ্ড কাক্ষিক মুকুল হইতে উৎপন্ন হইয়া ঠিক মাটির উপরিভাগে বৃদ্ধি পায়। ইহারা সরু ও লম্বা হয়। ইহা ক্রমান্বয়ে দ্রুতভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং মূল উদ্ভিদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে, যেমন—আমরুল। (চিত্র-ক)। (খ) **তোরণ ধারক**—ইহার প্রকৃতি ধারকের ন্যায় তবে কাণ্ডগুলি খিলানের আকার ধারণ করে, যেমন—থানকুনি।

(চিত্র-খ)। (গ) এরোহ—ইহারা ধারকের ন্যায় তবে জলে জন্মায়। পর্বমধ্য খুব ছোট ও মোটা হয়, যেমন—কচুরীপানা। (চিত্র-গ)। (ঘ) বক্রধারক—ইহাও ধারকের মত তবে মাটির নিচে থাকে। ভূ-নিম্নস্থ শাখাগুলি তির্যকভাবে মাটির উপরিভাগে চলিয়া আসে, যেমন—চন্দ্রমল্লিকা।

(৩) বায়বকাণ্ড—বিশেষ ধরনের কাজের উদ্দেশ্যে কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ডগুলি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, তাহাদের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে না। উৎপত্তি ও অবস্থান দেখিয়া তাহাদের কাণ্ডরূপে চেনা যায়। এই ধরনের কাণ্ডকে রূপান্তরিত কাণ্ড বলা হয়। বিশেষ বিশেষ কাজ অনুযায়ী তাহারা নানা প্রকারের হয়।



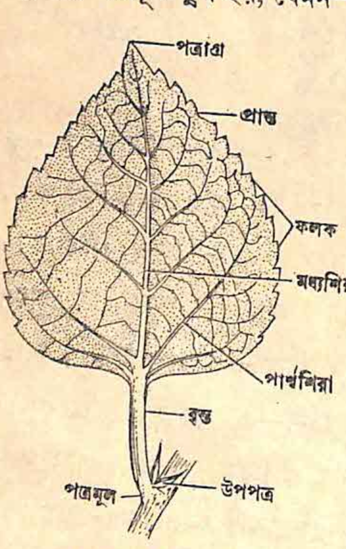
(ক) শাখা কণ্টক—অন্যান্য প্রাণী হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ড লম্বা ও সূচাল অঙ্গে পরিবর্তিত হয়। ইহারা অনেক সময় পাতা ও ফুল বহন করে, যেমন—দূরন্ত (চিত্র-ক)। (খ) শাখা আকর্ষ—আবার কোন বস্তুর উপরে আরোহণ করিবার জন্য কোন কোন দুর্বল শ্রেণীর বীরুৎ-এর কাণ্ড লম্বা ও মোটা সুতার ন্যায় অঙ্গে পরিবর্তিত হয়, যেমন—হাড়জোড়া (চিত্র-খ)। (গ) বালবিল—কোন কোন উদ্ভিদের কাক্ষিক মুকুল গোলাকার রূপ ধারণ করে। ইহার দ্বারা নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়, যেমন—খামালু। (ঘ) পর্বকাণ্ড—শুষ্ক বা মরুভূমি অঞ্চলে কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ডগুলি চ্যাপ্টা, চতুর্ভুজাকার বা গোলাকার হয়। ইহারা রসাল

ও সবুজ বর্ণের হয়। এই ধরনের রূপান্তরিত কাণ্ড, খাদ্য তৈয়ারী এবং জল সঞ্চয় করে, যেমন—ফণীমনসা (চিত্র-গ)। যে সকল উদ্ভিদের পর্ণকাণ্ড একটি পর্বমধ্য দ্বারা গঠিত তাহাকে একক পর্ণকাণ্ড বলে, যেমন—শতমূলী (চিত্র-ঘ)।

পাতা—কাণ্ডের পর্ব হইতে পাতা উৎপন্ন হয়। পাতার কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে। পাতা সাধারণতঃ সবুজ বর্ণের হয়। এই ধরনের পাতাকে পল্লবপত্র বলা হয়। ইহা ছাড়াও উৎপত্তি এবং প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের পাতা দেখা যায়, যথা—বীজপত্র, শল্কপত্র, মঞ্জরীপত্র ও পুষ্পপত্র।

পাতার বিভিন্ন অংশ—তিনটি প্রধান অংশের দ্বারা পাতা গঠিত হয়, যথা—পত্রমূল, বৃন্ত ও ফলক।

(১) **পত্রমূল**—পাতার যে অংশ কাণ্ডের পর্বের সহিত যুক্ত থাকে তাহাকে পত্রমূল বলা হয়। ইহার দুই পার্শ্বে সাধারণতঃ দুইটি উপপত্র থাকে। অধিকাংশ পাতার পত্রমূল ক্ষুদ্র হয়। কোন কোন পাতার পত্রমূল স্থূল হয়, যেমন—আম। অনেক ক্ষেত্রে পত্রমূল কাণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখে, যেমন—কলাপাতা, আবার আংশিকভাবে ঢাকিয়া রাখে, যেমন—নারিকেল পাতা।



পাতার বিভিন্ন অংশ

(২) **বৃন্ত**—ইহা একটি সরু নলাকার দণ্ডের ন্যায় এবং ইহা ফলককে ধরিয়া রাখে। কোন কোন পাতার আবার বৃন্ত থাকে না।

(৩) **ফলক**—পাতার চ্যাপ্টা ও পাতলা অংশটিকে ফলক বলা হয়। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ফলকের উভয় পৃষ্ঠের বর্ণ সমান হয়

না। উপরের পৃষ্ঠ ঘন সবুজ এবং নিম্নের পৃষ্ঠ ফিকা সবুজ বর্ণের হয়। ইহাকে বিষম পৃষ্ঠ পাতা বলে। ইহারা সমান্তরালভাবে থাকে, যেমন—কাঁঠাল। অধিকাংশ একবীজপত্রী উদ্ভিদের ফলক খাড়াখাড়িভাবে থাকে এবং উভয় পৃষ্ঠের বর্ণ সমান হয়। এই ধরনের পাতাকে সমাঙ্ক পৃষ্ঠ পাতা বলা হয়, যেমন—ধান।

ফলকের আকার—ফলকের আকার বিভিন্ন ধরনের হয়। যথা, রেখাকার, সূচাকার, লম্বাকার, বৃত্তাকার, উপবৃত্তাকার, ডিম্বাকার, তাম্বূলাকার, আয়তাকার, বৃক্কাকার, বিতিম্বাকার, চিতাম্বূলাকার, মালপত্রাকার, কলম্বপত্রাকার প্রভৃতি। (চিত্র দেখ)



ফলকের প্রান্ত—ফলকের কিনারাকে ফলকপ্রান্ত বলা হয়। ইহা নানা ধরনের হয়। ফলকপ্রান্ত মসৃণ হইলে অখণ্ড, যেমন—বট; ফলকপ্রান্ত ঢেউখেলানো হইলে তারকায়িত, যেমন—দেবদারু; করাতের মত কিন্তু দাঁতগুলি উপরের হইলে ক্রকচ, যেমন—জবা এবং দাঁতগুলি

নীচের দিকে হইলে দন্তুর বলা হয়, যেমন—শালুক। ইহা ছাড়াও আরো নানা ধরনের ফলকপ্রান্ত দেখা যায়।

ফলকের অগ্রভাগ—ইহা নানা রকমের হয়। অগ্রভাগ সরু কোণ সৃষ্টি করিলে সূক্ষ্মাগ্র, যেমন—আম; স্থূলাকার হইলে স্থূলাগ্র, যেমন—বট; সরু ও লম্বা হইলে দীর্ঘাগ্র, যেমন—অশ্বত্থ; কণ্টকাকার হইলে কণ্টকিত, যেমন—আনারস। ইহা ছাড়া আরো নানা ধরনের অগ্রভাগ দেখা যায়, যথা—আকর্ষীভূত।

ফলকের পৃষ্ঠদেশ—ইহা নানা ধরনের হয়, যথা—মসৃণ, চকচকে, রোমশ, আঁঠাল বা কণ্টকযুক্ত।

ফলকের শিরা-বিন্যাস—শিরা-উপশিরার বিন্যাস-রীতিকে শিরা-বিন্যাস বলে। শিরা-বিন্যাস দুই প্রকারের হয়। সাধারণতঃ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ফলকে শিরা-উপশিরাগুলি জালের মত বিস্তৃত থাকে এবং ইহাদের জালিকা শিরা-বিন্যাস বলে। ইহারা আবার দুইভাগে বিভক্ত।

(ক) **পক্ষল**—যে পাতায় একটি প্রধান শিরা থাকে এবং পার্শ্ব-শিরা-উপশিরাগুলি জালিকার সৃষ্টি করে তাহাকে পক্ষল শিরা-বিন্যাস বলে, যেমন—আম। (খ) **করতলাকার**—যে পাতায় একাধিক প্রধান শিরা বৃন্তের আগা হইতে উৎপন্ন হয় এবং পার্শ্বশিরাগুলি জালিকার সৃষ্টি করে তাহাকে করতলাকার শিরা-বিন্যাস বলে, যেমন—কুমড়া।

(২) **সমান্তরাল শিরা-বিন্যাস**—সাধারণতঃ একবীজপত্রী উদ্ভিদ ফলকে শিরাগুলি সমান্তরালভাবে থাকে। ইহাদের সমান্তরাল শিরা-বিন্যাস বলে। ইহারা দুইভাগে বিভক্ত।

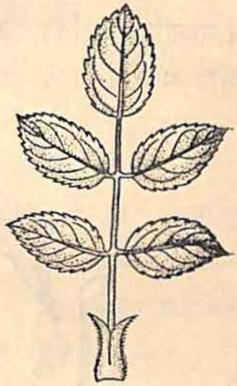
(ক) **পক্ষল**—পাতার একটিমাত্র প্রধান শিরা হইতে পার্শ্বশিরা-গুলি সমান্তরালভাবে থাকে, যেমন—কলাপাতা।

(খ) **করতলাকার**—পাতার একাধিক শিরাবৃন্তের আগা হইতে উৎপন্ন হইয়া সমান্তরালভাবে থাকে, যেমন—বাঁশপাতা।

একক পত্র ও যৌগিক পত্র—

একক পত্র—যখন বৃন্তের অগ্রভাগে একটি মাত্র সম্পূর্ণ অথবা আংশিক খণ্ডিত ফলক থাকে এবং খণ্ডন কখনই মধ্যশিরা স্পর্শ করে না তখন তাহাকে একক পত্র বলা হয়, যেমন—জবা।

যৌগিক পত্র—যখন বৃন্তের অগ্রভাগের ফলকটি অনেকগুলি খণ্ডে খণ্ডিত হয় অর্থাৎ ফলকের খণ্ডন মধ্যশিরা স্পর্শ করে তখন তাহাকে যৌগিক পত্র বলা হয়। ফলক খণ্ডগুলিকে পত্রক বলা হয়। এখানে বৃন্তের কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে কিন্তু পত্রকের কক্ষে মুকুল থাকে না। যৌগিক পত্রের মধ্যশিরাকে পত্রক অক্ষ বলা হয় যাহা পত্রক বহন করে। যেমন—গোলাপ। ইহারা দুইভাগে বিভক্ত।

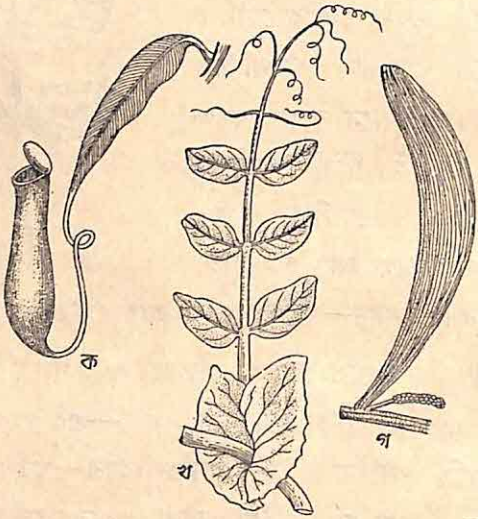


(ক) **পক্ষল**—পত্রকগুলি পত্রক অক্ষের দুই পার্শ্বে উৎপন্ন হয়। নানা ধরনের পক্ষল পত্র পাওয়া যায়, যথা—একপক্ষল, দ্বিপক্ষল, ত্রিপক্ষল ও অতি যৌগিক। (খ) **করতলাকার**—পত্রকগুলি বৃন্তের অগ্রভাগ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা নানা ধরনের হয়, যথা—এক-ফলক, দ্বিফলক, চতুর্ফলক ও অঙ্গুলাকার।

পরিবর্তিত পাতা—বিশেষ ধরনের কাজের জন্য পাতা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। অনেক সময় ইহারা এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, ইহাদের পাতারূপে চেনা যায় না। উৎপত্তি ও অবস্থান দেখিয়া চিনিতে হয়।

(২) **আকর্ষীভূত পাতা**—সমগ্র পাতা বা পাতার বিভিন্ন অংশ, যেমন—ফলকের অগ্রভাগ, বৃন্ত অথবা পত্রক আকর্ষে পরিবর্তিত হইয়া দুর্বল কাণ্ডকে আরোহণে সাহায্য করে, যেমন—মটরশুঁটি। (৩) পত্র-

কণ্টক—সমগ্র পাতা বা পাতার বিভিন্ন অংশ, যেমন—ফলকের অগ্রভাগ, প্রান্ত ও পৃষ্ঠদেশ আত্মরক্ষার জন্য ছোট ছোট কণ্টকে রূপান্তরিত হয়, যেমন—শিয়ালকাঁটা। (৪) **পর্ণবৃন্ত**—খাদ্য তৈয়ারীর জন্য বৃন্তটি চ্যাপ্টা হইয়া ফলকের আকার ধারণ করে, যেমন—আকাশমণি। (৫) **পতঙ্গভুক পত্র**—পতঙ্গ ধরিবার জন্য পাতার বিভিন্ন অংশ নানাভাবে পরিবর্তিত হয়, যেমন—ঘটপত্রী। এই উদ্ভিদের ফলকটি কলসীর আকার ধারণ করে। পত্রাগ্র ঢাকনাতে রূপান্তরিত হয়।

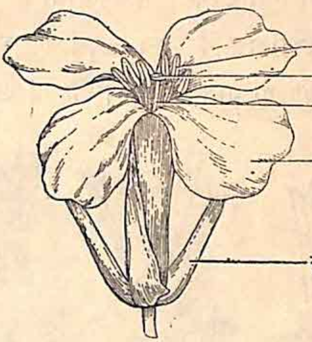


ফুল—ফুলের আকার, গঠন ও বর্ণ বিভিন্ন রকমের হয়। বিভিন্ন প্রকারের ফুলের আলোচনার পূর্বে তাহাদের বিভিন্ন অংশ জানা প্রয়োজন।

ফুলের বিভিন্ন অংশ—সাধারণতঃ ইহারা চারিটি স্তবক দ্বারা গঠিত। স্তবকগুলি বোঁটার আগায় অর্থাৎ পুষ্পাধারে পর পর সাজান থাকে।

(১) **বৃতি**—ইহা বাহিরের দিকে থাকে। ইহার অংশগুলিকে বৃত্যংশ বলে। ইহার রং সাধারণতঃ সবুজ হয়। বৃত্যংশগুলি পৃথক

পৃথকভাবে অথবা জুড়িয়া থাকে। (২) **দলমণ্ডল**—ইহা বৃতির ভিতরের দিকে থাকে। ইহার অংশগুলিকে দল বলে। ইহারা নানা বর্ণের হয়। ইহারাও পৃথক পৃথকভাবে অথবা জুড়িয়া থাকে। (৩) **পুংকেশর চক্র**—দলমণ্ডলের ভিতরের দিকে থাকে। অনেকগুলি পুংকেশরের দ্বারা এই চক্র গঠিত।

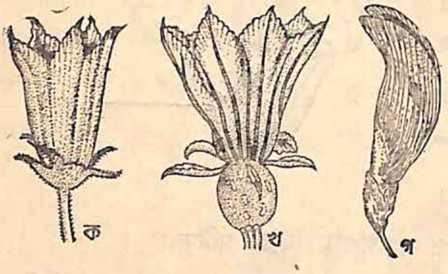


প্রত্যেকটি পুংকেশর সরু সূত্র ও পরাগধানী দ্বারা গঠিত।

(৪) **গর্ভকেশর চক্র**—ইহা ফুলের মাঝখানে থাকে। বিভিন্ন ফুলে এক বা একাধিক গর্ভকেশর থাকে। গর্ভকেশর তিনটি অংশে বিভক্ত। নিম্নের স্ফীত অংশটিকে ডিম্বাশয় বলে। ডিম্বাশয়ের অগ্রভাগ হইতে গর্ভদণ্ড বাহির হয়। গর্ভদণ্ডের অগ্রভাগকে গর্ভমুণ্ড বলে।

বিভিন্ন প্রকারের ফুল—(১) **সম্পূর্ণ ফুল**—যে ফুলের চারিটি স্তবক থাকে তাহাকে সম্পূর্ণ ফুল বলে, যেমন, ধুতুরা। (২) **অসম্পূর্ণ ফুল**—যে ফুলে কোন একটি স্তবক থাকে না তাহাকে অসম্পূর্ণ ফুল বলে, যেমন, কুমড়া। (৩) **একলিঙ্গ ফুল**—এই ফুলে পুংকেশর অথবা গর্ভকেশর থাকে, যেমন, কুমড়া। (৪) **উভলিঙ্গ**—এই ফুলে পুংকেশর এবং গর্ভকেশর থাকে, যেমন, ধুতুরা। (৫) **অরীয় সুষম ফুল**—এই ধরনের ফুলকে যে কোন তলে কাটিলে, দুইভাগে বিভক্ত হইবার পর প্রতি ভাগই সমান হয়, যেমন, ধুতুরা। (৬) **দ্বি-পার্শ্বীয় সুষম ফুল**—এই ধরনের ফুলকে একটিমাত্র তলে কাটিলে, দুইভাগে বিভক্ত হইবার পর প্রতিভাগই সমান হয়, যেমন, বকফুল। (৭) **অসুষম ফুল**—এই ধরনের ফুলকে যে কোন তলে কাটিলে সমানভাগে বিভক্ত হয় না। (৮) **গর্ভপাদফুল**—এই ধরনের ফুলে পুষ্পাধার উত্তল হয় এবং গর্ভকেশর অন্যান্য স্তবক অপেক্ষা সর্বাপেক্ষা ভিতরে ও উচ্চে অবস্থিত থাকে, যেমন, ধুতুরা।

খাদ্য সঞ্চয়ী পাতা—খাদ্য ও জল সঞ্চয়ের জন্য পাতা রসাল এবং স্থূল হয়, যেমন, ঘৃতকুমারী। (৯) **গর্ভশীর্ষ ফুল**—এই ধরনের ফুলে পুষ্পাধার কাপের ন্যায় অবতল হয় এবং ডিম্বাশয়ের গাত্রের সহিত জুড়িয়া যায়। পুষ্পাধারের প্রান্তদেশে অন্যান্য স্তবক সাজান থাকে, যেমন, কুমড়া। (১০) **গর্ভকটি ফুল**—এই ধরনের ফুলে পুষ্পাধার সমতল অথবা সামান্য সমতল হয় এবং গর্ভকেশর অন্যান্য স্তবকের সহিত পর পর সমতলে অথবা সামান্য উচ্চে থাকে, যেমন, বকফুল।



ফল—সাধারণতঃ ডিম্বাশয় ফলে রূপান্তরিত হয় তবে ফুলের অন্যান্য অংশ অথবা পুষ্পমঞ্জরী ফলে রূপান্তরিত হইতে পারে।

বিভিন্ন প্রকারের ফল—ইহাদের প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা, মৌলিক, গুচ্ছ ও যৌগিক।

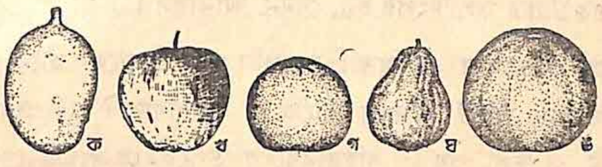


শুষ্ক ফল

(১) **মৌলিক**—যে ফুলের একটিমাত্র ডিম্বাশয় হইতে একটিমাত্র ফল উৎপন্ন হয় তাহাকে মৌলিক ফল বলে। ইহা দুইভাগে বিভক্ত।

(ক) **শুষ্ক**—এই ধরনের ফলের ত্বকটি পাতলা অথবা মোটা ও

শক্ত হয়। ইহা আবার স্ফোটক ও অস্ফোটক হয়। স্ফোটক ফলের ত্বকটি নানাভাবে ফাটে এবং বীজগুলি ছড়াইয়া পড়ে। অস্ফোটক ফলের ত্বক ফাটে না এবং বীজ ছড়াইয়া পড়ে না। স্ফোটক এবং অস্ফোটক ফল নানা প্রকারের হয়।



রসাল ফল

(খ) রসাল ফল—এই ধরনের ফলের ত্বক সাধারণতঃ তিনটি অংশের দ্বারা গঠিত। বাহিরের অংশ আবরণের সৃষ্টি করে। মাঝখানের অংশ শাঁসাল ও রসাল হয় এবং ভিতরের অংশ শক্ত ও মোটা অথবা পাতলা ও নরম হইতে পারে। রসাল ফল নানান প্রকারের হয়।

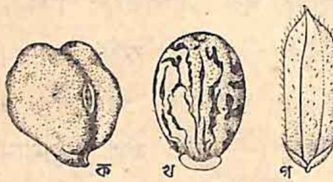
মৌলিক ফল (চিত্র দেখ)

- শুষ্ক
  - স্ফোটক
    - লেগিউম—মটরশুঁটি (চিত্র-ক)
    - ফলিকল—সাদর (চিত্র-খ)
    - সিলিকা—সরিষা (চিত্র-গ)
    - ক্যাপসিউল—ধুতুরা (চিত্র-ঙ)
  - অস্ফোটক
    - ক্যারিওপসিস—ধান (চিত্র-ঘ)
    - একিন—কৃষ্ণবালি
    - নাট্—পানিফল (চিত্র-চ)
- রসাল
  - ড্রুপ—আম (চিত্র-ক)
  - বেরী—পেয়ারা (চিত্র-খ)
  - পেপো—তরমুজ (চিত্র-ঙ)
  - পোম—আপেল (চিত্র-খ)
  - হেসপিরিডিয়াম—কমলালেবু (চিত্র-গ)

(২) **গুচ্ছ ফল**—ফুলের একটিমাত্র ডিম্বাশয় হইতে উৎপন্ন হয় কিন্তু গর্ভকেশরগুলি যুক্ত না থাকায় একটি ফুল হইতে অনেকগুলি ফল উৎপন্ন হয়, যেমন, কাঠালিচাঁপা।

(৩) **যৌগিক ফল**—পুষ্পমঞ্জরী হইতে অর্থাৎ অনেকগুলি ফুল হইতে একটিমাত্র ফল উৎপন্ন হয়, যেমন, আনারস।

বীজ—ডিম্বাশয়ে অবস্থিত ডিম্বকগুলি পরবর্তীকালে বীজে পরিণত হয়। বীজের দুইটি আবরণ থাকে। বহিরাবরণটি শক্ত ও ভিতরের আবরণটি পাতলা হয়। বহিরাবরণের উপরে যে দাগটি দেখা যায় তাহাকে প্রবীজনাভী বলে। ইহার পার্শ্বেই ডিম্বকরন্ধ্র নামে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। বীজের ভ্রূণ একটি বা দুইটি বীজপত্র এবং একটি সরু দণ্ড দ্বারা গঠিত। দণ্ডের উপরাংশের নাম ভ্রূণমুকুল এবং নিম্নাংশের নাম ভ্রূণমূল।



বিভিন্ন প্রকারের বীজ—বীজ দুই প্রকারের হয়।

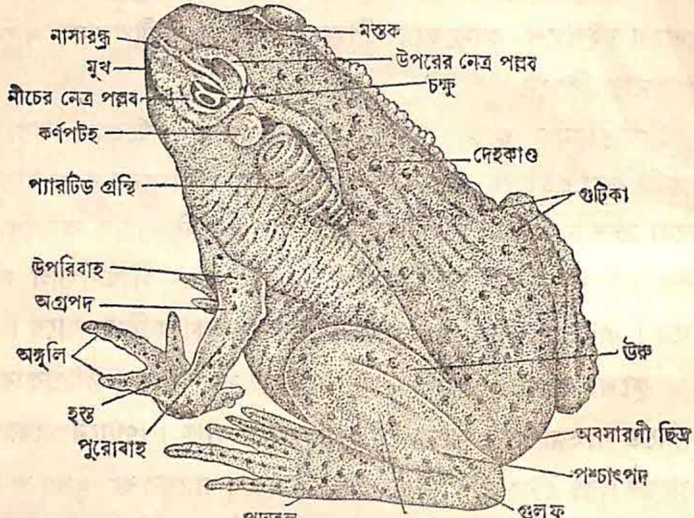
(১) **একবীজপত্রী বীজ**—এই বীজের ভ্রূণে একটি মাত্র বীজপত্র থাকে। ইহা দুইভাগে বিভক্ত। (ক) **শস্যযুক্ত বীজ**—অধিকাংশ বীজের বেশীর ভাগ অংশ শস্যের দ্বারা গঠিত। এই ধরনের বীজে বীজপত্রটি অতিশয় ক্ষুদ্র হয়, যেমন, ধান। (চিত্র-গ) (খ) **শস্যহীন বীজ**—কোন কোন বীজে শস্য থাকে না, যেমন, অর্কিড। (২) **দ্বিবীজপত্রী বীজ**—এই বীজের ভ্রূণে দুইটি বীজপত্র থাকে। ইহারাও দুইভাগে বিভক্ত। (ক) **শস্যযুক্ত বীজ**—এই বীজের বীজপত্র পাতলা কিন্তু শস্য অপেক্ষাকৃত স্থূল হয়, যেমন, রেড়ি। (চিত্র-ঘ) (খ) **শস্যহীন বীজ**—এই বীজের বীজপত্র খুব স্থূল হয়, যেমন, ছোলা। (চিত্র-ক)

বিভিন্ন প্রাণীর বহিরাকৃতি

ভেটকি মাছ—ভেটকি মাছ আমাদের নদীর মোহনায় থাকে। শীতকালেই ইহার প্রাচুর্য দেখা যায়। তখন বৃহৎ ভেটকিও পাওয়া যায়। সুস্বাদের জন্য ইহা বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। ভেটকির দেহ স্ট্রীমলাইণ্ড, মাথা ও লেজের দিকে সরু, কিন্তু মধ্যস্থলে চওড়া ও পুষ্ট। এইরূপ আকৃতির জন্য ভেটকি জলে স্বচ্ছন্দে বিনাবাধায় চলা-ফেরা করিতে পারে। এপিডারমিস্-এর নীচে থাকে, অন্তঃত্বক্ হইতে উৎপন্ন আঁশ। এই আঁশগুলি ঠিক ছাদের টালির মত সাজান থাকে। এই মাছটির আঁশের একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার পিছনের খোলা প্রান্তটিতে ধারাল কাঁটা সাজানো থাকে। এইরূপ কাঁটা থাকিলে আঁশকে বলা হয় টিনয়েড আঁশ। ভেটকি মাছের আত্মরক্ষার জন্য এইরূপ আঁশের প্রয়োজন। আঁশগুলি ভেটকি মাছের বহিঃকঙ্কাল বলা যাইতে পারে।

ভেটকির দেহ তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—মাথা, ধড় ও লেজ। মাথার অগ্রভাগকে স্নাউট বা তুণ্ড বলা হয়। মাথার বিস্তৃতি, তুণ্ড (স্নাউট) হইতে কানকোর অগ্রভাগ পর্যন্ত। এইস্থান হইতে পায়ু পর্যন্ত দেহের অংশটিকে বলা হয় ধড়। বাকী অংশটি পিছনদিকে থাকে, তাহার নাম লেজ। তুণ্ডের কিছুটা উপরে একজোড়া নাসারন্ধ্র থাকে। আমরা জানি যে, নাসারন্ধ্র স্থলের প্রাণীর মুখগহ্বরের সহিত যোগ আছে—এই পথে শ্বসন হয়। কিন্তু ভেটকি মাছ এবং অধিকাংশ মাছের নাসারন্ধ্র মুখবিবরের সহিত যোগ থাকে না বলিয়া শ্বসনে ব্যবহার হয় না। প্রধানতঃ ঘ্রাণের জন্য ইহার ব্যবহার হয়। মাথার দুইপাশে দুইটি চোখ থাকে। চোখের কোন নেত্রপল্লব থাকে না। নেত্রপল্লব থাকিলে জলে তাহার স্বচ্ছন্দ গতির বাধা সৃষ্টি করিত। উপরে ও নীচে একটি করিয়া চোয়াল থাকিয়া মুখ বেষ্টিত হয়। চোয়ালে সূক্ষ্ম দাঁত থাকে। মাথার দুইধারে দুইটি হাড়ের কানকো থাকে; ইহার পিছনের কানায় ঝালরের মত একটি ব্র্যাঙ্কিয়োস্টিগাল পরদা থাকে।

খুব পাতলা ও সামান্য স্বচ্ছ—ইহা পরদার মত চোখের উপর বিস্তৃত হইতে পারে ; ইহার নাম উপপল্লব বা Nictitating membrane. চোখের পিছনে একটি গোলাকার কর্ণপটহ (Tympanic membrane) থাকে। ইহাদের ধড়টি বা দেহকাণ্ড বেশ পুষ্ট এবং ইহার উপরের বা পৃষ্ঠদেশের রং নীচের বা অঙ্কীয় দেশের রং অপেক্ষা ঘোর। চোখের পিছনে একটি উঁচু ও লম্বা ধরনের প্যারটিড গ্রন্থি থাকে। প্যারটিড গ্রন্থি ও আঁচিলগুলি হইতে

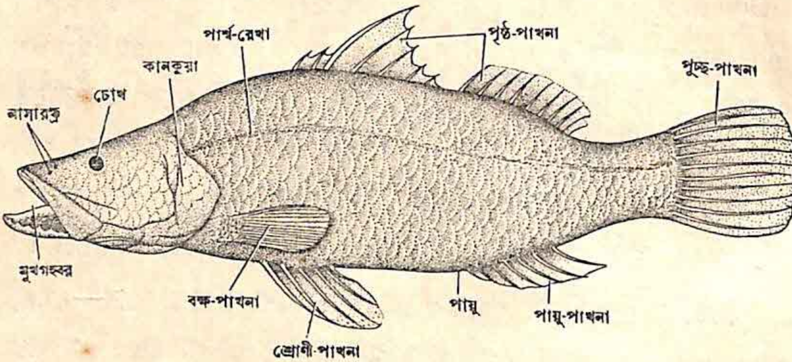


একপ্রকার সাদা ও বিষাক্ত রস নির্গত হইয়া শত্রুর শরীরে সবেগে আঘাত করে। এইরূপে ব্যাঙ শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করে। ধড়ের পিছনে অবসারণী ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র দিয়া মল-মূত্র, পুরুষ ব্যাঙের শুক্রাণু ও স্ত্রী ব্যাঙের ডিম্বাণু বাহির হয়। ইহাদের অগ্রপদের প্রথম অংশটির নাম উপরিবাহ, দ্বিতীয় অংশের নাম পুরোবাহ ও তৃতীয় অংশের নাম হস্ত। হস্ত ও পুরোবাহর সংযোগস্থলকে বলা হয় মণিবন্ধ বা কব্‌জি। হস্তে চারিটি নখবিহীন আঙ্গুল থাকে। পিছনের পায়ের প্রথম অংশটির নাম উরু (thigh)। ইহা ধড়ে লাগান থাকে। দ্বিতীয়

অংশকে মধ্যপদ (shank) এবং তৃতীয় অংশকে চরণ (foot) বলে। ঊরু ও মধ্যপদের সংযোগস্থলকে হাঁটু বলে এবং মধ্যপদ ও চরণের সংযোগস্থলকে বলা হয় গুল্‌ফ। চরণে পাঁচটি নখরবিহীন আঙ্গুল থাকে। ব্যাঙের চরণের আঙ্গুলগুলি অনেকটা হাঁসের পায়ের মত চামড়ায় জোড়া। এইরূপ জোড়া পায়ের দ্বারা ব্যাঙ সহজেই লাফাইতে ও সাঁতার কাটিতে পারে।

গিরগিটি—আমাদের দেশে গাছে বা বাগানের টিকটিকির নাম ক্যালটিস্ ভারসিকলর। ইহা গাছে বাস করে ও পোকামাকড় খায়। ইহার অন্যনাম রক্ত চোষা (Blood sucker), কারণ ইহার গলার চামড়া লাল। একটি ক্যালটিস্ মাথার অগ্রভাগ হইতে লেজের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ১ ফুট লম্বা। সমস্ত দেহ কর্কশ শল্কে ঢাকা। গলার ও ধড়ের পৃষ্ঠদেশে শল্কগুলি কাঁটায় পরিণত হয়। ক্যালটিস্ যখন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে তখন সে উপরে ও নীচে মাথা নাড়ায়। গিরগিটির দেহ সাতটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—মাথা, গলা, ধড় বা দেহকাণ্ড (বক্ষ ও উদর), একজোড়া অগ্রপদ ও একজোড়া পশ্চাৎপদ। গিরগিটির মুখ চওড়া। ইহা মাথার সম্মুখে আড়াআড়িভাবে থাকে। দুইটি চোয়ালে দাঁত আছে। মাথায় ও গায়ে দুইটি বড় ছিদ্র থাকে। ইহাদের বলা হয় নাসারন্ধ্র। মাথার দুইধারে দুইটি চোখ থাকে, ইহারা প্রধানতঃ দুইটি চোখের পাতা বা নেত্র-পল্লবের দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। গিরগিটি এই নেত্রপল্লব দুইটি নাড়িতে পারে। একটি তৃতীয় নেত্রপল্লব বা উপপল্লব থাকে। গিরগিটি ইহা চোখের সামনের কোণে গুটাইয়া রাখিতে পারে। দুইটি চোখের পিছনে একটি কর্ণপটহ বা টিমপ্যানিক মেম্ব্রেন থাকে। সাধারণ চামড়ার একটু গভীরে ইহা অবস্থিত। ধড়টি লম্বা। অঙ্কীয়দেশে ইহা চ্যাপটা ও পৃষ্ঠদেশে উত্তল। একজোড়া অগ্রপদ ও একজোড়া পশ্চাৎপদ ধড়ে লাগান থাকে। দুইটি

ফুলকা প্রকোষ্ঠটিকে কানকো তাহার ব্র্যাঙ্কিয়োস্টিগাল পরদার সহিত বাহির হইতে ঢাকিয়া রাখে। একটি শ্বসন ছিদ্রের দ্বারা ফুলকা প্রকোষ্ঠ বাহিরে উন্মুক্ত হয়। এই ছিদ্র দিয়া শ্বসনের দূষিত জল ফুলকা প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে যায়। ব্র্যাঙ্কিয়োস্টিগাল পরদা দেহের সহিত নিবিড়ভাবে লাগিয়া থাকিতে পারে বলিয়া এই ছিদ্রটি ভাল করিয়া বন্ধ করা যায়, যখন ইহার দ্বারা জলনিষ্কাশনের প্রয়োজন হয় না। ধড় ও লেজের দুই পাশে সম্মুখ হইতে পিছন পর্যন্ত একটি করিয়া কাল পার্শ্বরেখা



থাকে। এই রেখার দ্বারা ভেটকি মাছ পারিপার্শ্বিক জলের সূক্ষ্ম কম্পন অনুভব করিতে পারে। তাই পার্শ্বরেখাটি ভেটকি মাছের অন্যতম প্রধান ইন্দ্রিয়স্থান। ধড় ও লেজের সংযোগ স্থানে, মাছের অঙ্কীয় দেশে, একটি ছোট পরিধির, অগভীর নীচু স্থান আছে। এই স্থানকে বলা হয় ভেন্ট। ভেন্টে চারিটি ছিদ্র দেখা যায়, যথা—সম্মুখের পায়ুর দ্বারা পৌষ্টিকনালী বাহিরে উন্মুক্ত হয়, পশ্চাতে থাকে মূত্র নিষ্কাশনের ছিদ্র ও দুই পাশে থাকে দুইটি জননছিদ্র। কতকগুলি দাঁড়ের দ্বারা নৌকা যেমন জলে দ্রুতগতিতে চলে, তেমনি ভেটকি মাছ তাহার শক্তিশালী লেজটির সঞ্চালনের ফলে জলে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিতে পারে।

ভেটকির দেহে পাখনা বা ফিন নামে কতকগুলি উপাঙ্গ দেখা যায়। ত্বকের একটি পাতলা পাটের দ্বারা পাখনা গঠিত হয়। হাড় বা কচকচির

কতকগুলি সরু ও সূক্ষ্ম রড পাখনাগুলির ভিতর থাকিয়া তাহাদের সুরক্ষিত করে। প্রধানতঃ দুইপ্রকার পাখনা থাকে—যথা, জোড় ও বিজোড় পাখনা। বিজোড় ও জোড় পাখনার নাম যথাক্রমে মিডিয়ন ও পেয়ার্ড ফিন। তিন প্রকার বিজোড় পাখনা থাকে, যথা—(ক) সামনে ও পিছনে পৃষ্ঠদেশীয় পাখনা (খ) লেজের পাখনা (গ) পায়ু পাখনা বা অঙ্কীয় পাখনা। ইহা লেজের অঙ্কীয় দেশে থাকে। জোড় পাখনা (ক) একজোড়া বক্ষ পাখনা বা পেকটোরাল ফিন (খ) একজোড়া শ্রোণী পাখনা বা পেলভিক ফিন। বক্ষ পাখনা দুইটি দেহের দুইপাশে কানকোর পিছনে থাকে, শ্রোণীপাখনা থাকে বক্ষ পাখনার পিছনে।

যে কোনও একোয়ারিয়ামে মাছের গতি পর্যবেক্ষণ করা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে শক্তিশালী লেজের ঘন সঞ্চালনের দ্বারা মাছ জলের মধ্যে দ্রুত চলাফেরা করিতে পারে। মাছের গতি ব্যাহত করিতে, গতির দিক পরিবর্তন করিতে বা ভাসাইয়া রাখিতে পাখনাগুলি সহায়তা করে। এইভাবে মাছ খাদ্য আহরণ ও আত্মরক্ষা করিতে পারে।

কুনো ব্যাঙ (টোড)—বাংলাদেশে সাধারণতঃ দুইপ্রকার ব্যাঙ দেখিতে পাওয়া যায়, কুনো ব্যাঙ ও কোলা ব্যাঙ। এখানে আমরা কুনো ব্যাঙের (বা টোডের) বর্ণনা করিব। ইহার গায়ের রং ধূসর ও কর্কশ, ত্বকের উপর বড় বড় ধারাল আঁচিল বা গুটিকা (Wart) থাকে।

ব্যাঙের দেহকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—মাথা, ধড়, একজোড়া সামনের পা (অগ্রপদ), একজোড়া পিছনের পা (পশ্চাৎপদ)। ইহাদের দেহ লেজবিহীন। কুনো ব্যাঙের মাথা ত্রিকোণাকৃতি, মুখের ছিদ্র খুব চওড়া এবং উপর ও নীচের চোয়ালে দাঁত নাই। মাথার সামনে ও মুখের কিছু উপরে একজোড়া নাসারন্ধ্র আছে। শ্বসনের জন্য নাসারন্ধ্রের, মুখগহ্বরের সহিত যোগ আছে। মাথার দুই পাশে দুইটি চোখ আছে। প্রত্যেক চোখে তিনটি নেত্রপল্লব থাকে। উপরে নেত্রপল্লব পুষ্ট। নীচের নেত্রপল্লবটি অপরিণত; তৃতীয় নেত্রপল্লবটি

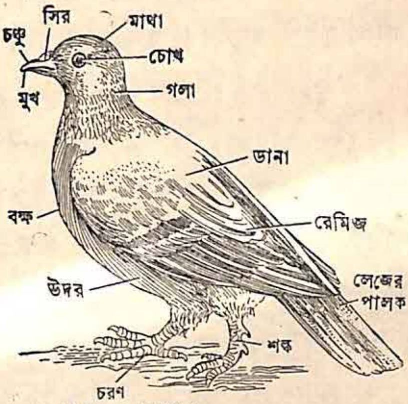
পদেরই পাঁচটি করিয়া আঙ্গুল থাকে, তাই এইরূপ পদকে বলা হয় পঞ্চাঙ্গুল গঠনের পা (Pentadaclyle limb) অগ্রপদটি ধড়ের সহিত যুক্ত থাকে ঠিক গলার পিছনেই। ইহাতে থাকে একটি পুরোবাহ একটি উপরিবাহ ও পাঁচটি আঙ্গুলবিশিষ্ট হাত। প্রথম আঙ্গুলের নাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। আঙ্গুলগুলির ডগায় একটি করিয়া ধারাল নখর আছে। পশ্চাৎপদ ধড়ের পিছনে ও কিছুটা অঙ্কীয় স্থানে থাকে। পশ্চাৎ-পদের প্রথম অংশের নাম উরু, দ্বিতীয় অংশটি পদ ও শেষ অংশটি চরণ। চরণে পাঁচটি নখরবিশিষ্ট দীর্ঘ আঙ্গুল আছে। প্রথম আঙ্গুলটি অন্য আঙ্গুলের চেয়েও বড় ; ধড়ের সম্মুখভাগের নাম বক্ষ। পিছনের অংশের নাম উদর। উদর ও লেজের সংযোগ স্থলে অঙ্কীয় দেশে আড়াআড়িভাবে থাকে একটি অবসারণী বা ক্লোয়াকাল ছিদ্র। দীর্ঘ লেজটি সামনে মোটা ও পিছন দিকে সরু হইয়া যায়। লেজটির ধড়ের সহিত ভারসাম্য থাকে বলিয়া গিরগিটি ডালে বসিয়া থাকিতে পারে,—মাটিতে পড়িয়া যায় না।



পায়রা—পায়রার দেহের গঠন নৌকার মত। এইরূপ আকৃতিকে স্ট্রিমলাইণ্ড শেপ বলা হয় (মাছ দেখ)। এইরূপ আকৃতির জন্য সে বাধাহীনভাবে স্বচ্ছন্দে বায়বীয় পরিবেশে উড়িতে পারে—এইজন্য তাহার গতি সাবলীল ও সুন্দর। অনেক পাখীর দেহের বর্ণ বৈচিত্র্য

ও সুমিষ্ট কণ্ঠসঙ্গীত, যুগ যুগ ধরিয়া কবিদের আকৃষ্ট করিয়াছে—কিন্তু পাখী, সাধারণ মানুষের নিকটও কম প্রিয় নয়।

পায়রার দেহ পালক দিয়া ঢাকা থাকে। পায়রার নৌকার ন্যায় আকৃতি, প্রধানতঃ ঘন পালকের আচ্ছাদনের জন্য। পালকের এইরূপ ঘন আবরণ থাকায় ইহার দেহের তাপের অযথা ব্যয় হয় না। এইজন্য দেহের তাপনিয়ন্ত্রণের সুবিধা হয়। সামনের পালকগুলি পিছনের পালককে ঢাকিয়া রাখে। লেজের পালকগুলি দীর্ঘ হয়।



(চারিটি নখর বিশিষ্ট)

পায়রার দেহ কতকগুলি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—মাথা, গলা, ধড়, লেজ, একজোড়া অগ্রপদ ও একজোড়া পশ্চাৎপদ।

মাথাটি ছোট, গোলাকার ও সামনে একটি চঞ্চু থাকে। দুইটি শক্ত আবরণে চঞ্চু ঢাকা থাকে। মাথা ও চঞ্চুর সংযোগস্থলে দুইটি নাসারন্ধ্র থাকে। ইহাদের ঠিক উপরে থাকে চামড়ার দুইটি ক্ষুদ্র পুঁটলি, ইহাদের নাম সির্। নাসারন্ধ্রের, মুখগহ্বরের সহিত যোগ থাকে বলিয়া শ্বসনের সুবিধা হয়। স্থলের মেরুদণ্ডী প্রাণীর ইহা একটি বিশেষত্ব। মাথার দুইধারে একটু উপরের দিকে দুইটি বড় চোখ আছে। প্রত্যেক চোখ তিনটি নেত্রপল্লবের দ্বারা সুরক্ষিত। উপরের ও নীচের নেত্রপল্লব ও তৃতীয় নেত্রপল্লব, উপপল্লব (বা নিকটিটেটিং মেম্‌ব্রেন)। তৃতীয় নেত্রপল্লব চোখের এক কোণ হইতে অন্য কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ইহাকে সাময়িকভাবে সূক্ষ্ম পরদার মত ঢাকিয়া রাখে—চোখ এইভাবে সুরক্ষিত হয় ও ইহাকে পরিষ্কারও করা হয়। চক্ষু দুইটিও বড়, তাহার কারণ দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতার উপর পাখীর জীবন

নির্ভর করে—আকাশে উড়িবার সময় তাহাকে বহুদূরে দেখিতে হয়। তাহার খাদ্যের, পানীয়ের ও সাময়িক আশ্রয়ের জন্য নীচের জমিকেও প্রয়োজন। চোখের পিছনে ও মাথার দুইধারে ছোট ছোট পালকে ঢাকা দুইটি কানের ছিদ্র থাকে। পাখীর শ্রবণশক্তিও খুব তীক্ষ্ণ।

স্ট্রিমলাইণ্ড গঠনের জন্য মনে হয় গলাটি ছোট ও মাথার সহিত ধড় বেশ অবিচ্ছিন্নভাবে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু আসলে গলা বেশ লম্বা। একটু দেখিলে বুঝা যাইবে যে, পাখীর অগ্রপদ ডানায় পরিণত হওয়ায় ওড়া ছাড়া ইহা অন্য কোনও কাজের উপযোগী নয়। এইজন্য লম্বা গলা ও ছুঁচলো চঞ্চু নানাভাবে চালিত করিয়া পাখীটি নানা কাজ করিতে পারে।

পায়রার ধড় দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। সম্মুখে থাকে বক্ষ ও পিছনে উদর। বক্ষের ভিতরে থাকে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান অঙ্গ। বক্ষ সুরক্ষিত থাকে পাঁজরা প্রভৃতি কতকগুলি হাড়ের দ্বারা ও সুগঠিত মাংসপেশীর দ্বারা। ভাল করিয়া স্পর্শ করিলে ইহা বুঝা যায়। পায়রা যখন স্থির হইয়া বসিয়া থাকে তখন বুকের উঠানামা হইতে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালী দেখা যায়। উদরে, দেহের অন্য অনেক প্রধান অঙ্গ থাকে, যথা—পৌষ্টিকতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, জননেন্দ্রিয়। উদর বেশীর ভাগ মাংসপেশী দিয়া গঠিত। স্পর্শ করিলে ইহা ভাল করিয়া বুঝা যায়।

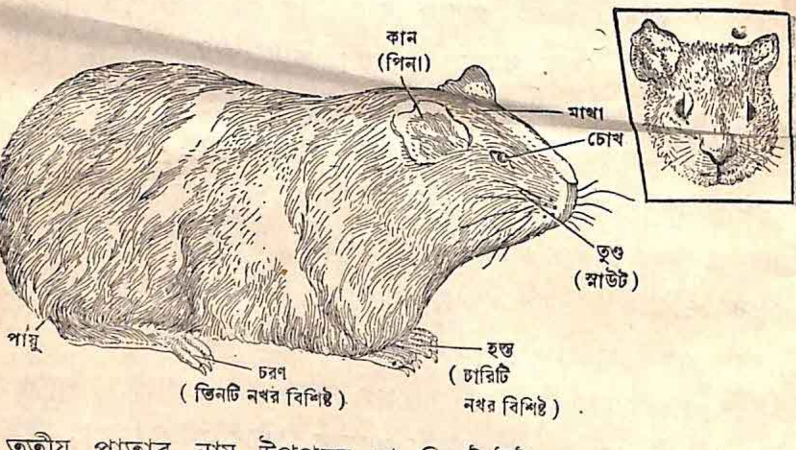
পায়রার লেজটি ক্ষুদ্র, তবে লম্বা লম্বা পালক থাকায় লেজটি বেশ লম্বা দেখায়। পালকগুলি ছড়াইয়া থাকিলে একটি পাখার আকার হয়। লেজ ও উদরের সংযোগস্থলে একটি আড়াআড়িভাবে ছিদ্র থাকে, ইহা অবসারণী বা ক্লোয়াকাল ছিদ্র।

পালক ছাড়াইয়া ফেলিলে অগ্রপদের প্রধান অংশগুলি দেখা যায়। যথা—উপরিবাহু, পুরোবাহু ও হস্ত। হস্তে একটি আঙ্গুল পৃথক্‌ভাবে দেখা যায়। ইহাই বুড়ো আঙ্গুল। সম্মুখে প্রিপ্যাটেজিয়াম নামে একটি চামড়ার পাট, কাঁধের সহিত উপরিবাহুকে যুক্ত করে।

এইপ্রকার অন্য একটি পাট, বগলে আড়াআড়িভাবে থাকে। ইহার নাম পোস্টপ্যাটেজিয়ম। হাওয়াতে ভাসিতে ও উড়িতে সুবিধার জন্য এই দুইটি পাট ডানার তল বৃদ্ধি করে। কিন্তু ডানাটি প্রশস্ত হয় ২৩টি রেমিজ পালক (উড়িবার পালক) দিয়া। এই পালকগুলি ডানার পিছনে লাগান থাকে। এই পালকগুলির মধ্যে ১১টির নাম প্রাইমারিজ—ইহারা হাতে লাগান থাকে। অবশিষ্ট ১২টি পালক পুরোবাহুতে লাগান থাকে, ইহাদের নাম সেকেণ্ডারিজ। বুড়ো আঙ্গুলে একগুচ্ছ ছোট পালক লাগানো থাকে, তাহার নাম বাসটার্ড ডানা। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, অন্য দুই প্রকার পালক পাখীর দেহে থাকে। প্রচুর ছোট ছোট কনটুর পালকই পায়রার দেহের গঠনের বৈশিষ্ট্য, যাহার বিষয়ে প্রথমেই বলা হইয়াছে। অন্যপ্রকার পালকটি সূক্ষ্ম সূতার মত, তাহার নাম ফাইলোপ্লুম। পশ্চাৎপদেরও তিনটি প্রধান ভাগ থাকে, যথা—উরু, পদ ও চরণ। চরণে চারিটি আঙ্গুল থাকে। প্রথম আঙ্গুলটি পিছন-দিকে ও বাকী তিনটি আঙ্গুল সম্মুখে থাকে। প্রত্যেকটি আঙ্গুলের ডগায় একটি করিয়া ধারাল নখর থাকে। চরণের এইরূপ গঠনের জন্য পায়রা গাছের ডাল বা আশ্রয় সহজেই জোরে ধরিয়া রাখিতে পারে। পা দুটি দীর্ঘ হওয়ায় মাটির উপর স্বচ্ছন্দে হাঁটিতে পারে। চরণ দুইটি সরীসৃপের মত শল্কে ঢাকা থাকে। অগ্রপদটি ডানায় পরিণত হইয়াছে বলিয়া দাঁড়াইবার সময় পশ্চাৎপদকে দেহের সব ভার বহন করিতে হয়।

গিনিপিগ—গিনিপিগ আমাদের অতি পরিচিত পোষা গৃহ-পালিত প্রাণী। ইঁদুর, খরগোস, গিনিপিগ, কাঠবেড়ালী প্রভৃতি জন্তু একই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার দেহ ৮টি প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা—মাথা, গলা, ধড়, অগ্র ও পশ্চাৎপদ। ইহার লেজ থাকে না। প্রায় সমস্ত দেহ লোমে ঢাকা। সাদা, বাদামী, কাল প্রভৃতি রঙের গিনিপিগ দেখা যায়। ইহার মাথা লম্বা ধরনের এবং সম্মুখভাগ সরু ও সামান্য প্রলম্বিত, এই অংশটিকে তুণ্ড বা স্নাউট বলা হয়। স্নাউটের উপর

গোঁফের মত কতকগুলি বেশ শক্ত ও লম্বা লোম থাকে। এই লোমগুলি সুবেদী ও ইহাদের ভিব্রিসি বলা হয়। স্নাউটের অগ্রে একজোড়া নাসারন্ধ্র থাকে। নাসারন্ধ্রের নীচে মুখ থাকে। দুইটি ঠোঁট মুখকে বেষ্টিত করিয়া রাখে। উপরের ঠোঁটটি কাটা (ছোট ছবিটি দেখ)। এইরূপ কাটা ঠোঁটকে বলা হয় হেয়ারলিপ। হেয়ারলিপ থাকার জন্য বাটালির মত দুইটি ইনসাইসার দাঁত দেখা যায়। মাথার দুই ধারে দুইটি বড় চোখ আছে। ইহারা সুরক্ষিত থাকে তিনটি চোখের পাতার দ্বারা। উপর ও নীচের চোখের পাতায় কয়েকটি অক্ষিপক্ষ থাকে।



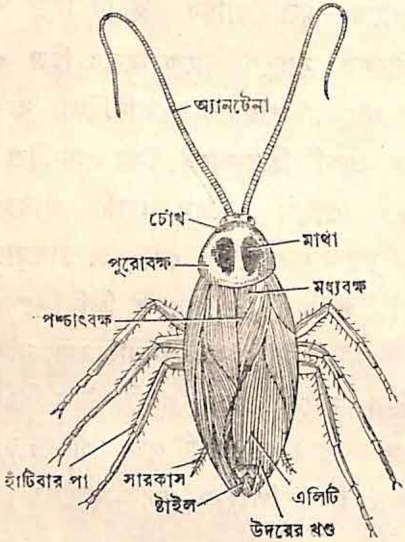
তৃতীয় পাতার নাম উপপল্লব বা নিকটিটেটিং মেমব্রেন। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা চোখের ভিতরের কোণ হইতে বাহিরের কোণ পর্যন্ত চোখের উপর পর্দার মত টানিয়া চোখ পরিষ্কার করা যায়। অন্য স্তন্যপায়ী জন্তুর মত গিনিপিগের দুইটি বহিঃকর্ণ বা পিনা থাকে। যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছে সেইদিকে পিনা ফিরাইতে পারে বলিয়া গিনিপিগের শুনিতে সুবিধা হয়। পিনার সহিত মাথার সংযোগস্থলে বাহিরের শ্রবণের ছিদ্র থাকে। একটি বাহিরের শ্রবণের নল এই ছিদ্র হইতে শুরু হইয়া কর্ণপটহে শেষ হয়। গিনিপিগের গলাটি ছোট। ইহার দ্বারা মাথার সহিত ধড়ের যোগ হয় ও মাথাটি নানাদিকে নাড়া যায়। ধড়ের সামনের অংশটি বক্ষ। পিছনের অংশটির

নাম উদর। উদরের অঙ্কীয় স্থানে থাকে একজোড়া স্তনের বোঁটা। পুরুষ গিনিপিগে ইহা অপরিণত থাকে। উদরের পিছনের দিকে থাকে পায়ু। পায়ুর অঙ্কীয় স্থানে থাকে মূত্র বাহির হইবার ছিদ্র ও জননছিদ্র। পুরুষ ও স্ত্রী গিনিপিগের সম্মুখে থাকে মূত্রের ছিদ্র ও জননছিদ্র এবং পিছনে পায়ু থাকে, তাহাকে পেরিনিয়ম বলা হয়। পুরুষের লিঙ্গের অগ্রভাগে একটি ছিদ্র থাকে, ইহা জননছিদ্র; ইহা হইতে মূত্রও বাহির হয়। প্রেপুস নামে একটি আবরণ ত্বক লিঙ্গের অগ্রভাগকে ঢাকা রাখে। লিঙ্গের গোড়ায় চামড়ার ছোট থলির মত একটি অণ্ডকোষ থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক গিনিপিগের অণ্ডকোষে দুইটি শুক্রাশয় থাকে। স্ত্রী গিনিপিগের জননছিদ্রের নাম স্ত্রীযোনিদ্বার বা ভালভা। লেবিয়া নামে ত্বকের দুইটি ভাঁজ দিয়া ভালভা বেষ্টিত। আলপিনের গোল মাথার মত একটি ক্ষুদ্র ভগাঙ্কুর বা ক্লাইটোরিস ভালভার সম্মুখে থাকে। ইহার পিছনেই থাকে মূত্রাশয়।

প্রত্যেকটি অগ্রপদে একটি উপরিবাহু, একটি পুরোবাহু ও একটি হাত থাকে। হাতে নখরবিশিষ্ট চারিটি আঙ্গুল থাকে। পশ্চাৎপদ দুইটিতে থাকে, উরু, পদ, গুল্‌ফ ও চরণ। হাঁটিবার সময় গিনিপিগ তাহার চারিটি পা ব্যবহার করে। ইঁদুরের বংশের অন্য জন্তুর মত গিনিপিগ মাটি খুঁড়িতে, তাহার অগ্রপদ ব্যবহার করে। লাফাইবার জন্য পশ্চাৎপদ উপযোগী।

আরসোলা—আরসোলা পতঙ্গশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। একটি বড় আরসোলা প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা। সমস্ত দেহটি একটি কালচেটে বাদামী রঙের কৃত্তিকে (Cuticle) ঢাকা। এই বহিরাবরণ কাইটেন নামক একটি পদার্থের দ্বারা গঠিত। ইহা অন্য পতঙ্গ ও সকল সন্ধিপদ প্রাণীর বাহিরের শক্ত আবরণটি প্রস্তুত করে। আবরণটিকে ঐ সকল প্রাণীর বহিঃকঙ্কাল ও (Exoskeleton) বলা যাইতে পারে। ইহার কারণ কঙ্কালের প্রধান কাজ দেহের প্রধান অংশগুলিকে সুরক্ষিত

করা ও একটি বিশেষ আকৃতি ও রূপ প্রদান করা। কাইটেনে প্রস্তুত কৃত্তিকের দ্বারা পতঙ্গটির দেহে ঐ দুইটি কাজই হয়।



আরসোলার দেহকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—মাথা, ছোট গলা, বক্ষ ও উদর। বক্ষে তিনটি বড় অংশ (Segment) আছে; ইহাতে তিনজোড়া পা ও ডানা যুক্ত থাকে। উদরটি বক্ষ হইতে লম্বা এবং দশটি ক্ষুদ্র অংশের দ্বারা গঠিত। দেহের প্রতি খণ্ডকের উপরকার আবরণের নাম টারগাম ও নীচের আবরণটিকে বলা হয় স্টারনাম্।

আরসোলার মাথাটি ডিম্বাকৃতি, ইহা দেহের সহিত একটি সরু গলা দিয়া যুক্ত থাকে। মাথার দুইধারে বৃক্কের আকৃতি একটি করিয়া পুঞ্জাক্ষি (Compound Eye) থাকে। একটি পুঞ্জাক্ষিতে অসংখ্য সরলাক্ষি (Simple Eye) থাকে। এই সরলাক্ষির নাম ওমাটিডিয়ম্। এইগুলি ঠাসাঠাসিভাবে সাজান থাকে। যে স্বচ্ছ কৃত্তিকাটি পুঞ্জাক্ষিকে আচ্ছাদিত করে তাহা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণ্য বহু ভুজে বা ফেসেটে বিভক্ত। প্রত্যেকটি ফেসেট একটি ওমাটিডিয়মের বাহিরের তল। দুইটি চোখের নীচে একটি করিয়া লম্বা চাবুকের মত শুঙ্গ বা অ্যানটেনা থাকে। ইহাদের অনেকগুলি গাঁট থাকে। শুঙ্গতে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়স্থান থাকায় তাহাদের দ্বারা স্পর্শ, গন্ধ ও সূক্ষ্ম স্পন্দনের অনুভূতি হয়। দেখা যায় যে, প্রাণীটি সব সময় মাটি শুঙ্গের দ্বারা স্পর্শ করিয়া অনুভব করিতেছে। মাঝে মাঝে

অ্যানটেনাটি মাথার উপরে সঞ্চালন করিয়া বাতাস অনুভব করিবার চেষ্টা করে।

মুখোপাঙ্গ বা মাউথ পার্টস্—মাথার নীচের ও সামনের প্রান্তে একটি ছোট ঝালরের মত উপরের ঠোঁট বা লেব্রম মুখের সামনে ঝুলিতে থাকে। মুখের দুই পাশের তিন জোড়া চোয়াল খাদ্যগ্রহণের সময় আড়াআড়িভাবে একপাশ হইতে অন্য পাশে নড়ে। প্রথম দুইটি চোয়ালের নাম ম্যাণ্ডিব্‌ল। ইহার ভিতর দিককার প্রান্তে থাকে কামড়াইবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্ত দাঁত। ম্যাণ্ডিবলের পিছনে থাকে প্রথম ম্যাক্সিলা। প্রত্যেকটি প্রথম ম্যাক্সিলার তলদেশে কার্ডো ও স্টাইপেস নামে দুইটি সন্ধি থাকে। স্টাইপেসের বাহিরে যুক্ত থাকে পাঁচটি সন্ধিবিশিষ্ট একটি ম্যাক্সিলারি প্যাল্প—ইহা একটি স্পর্শেন্দ্রিয়। প্যাল্পের ভিতরে একটি দ্বিখণ্ডিত অঙ্গ থাকে, ইহা গঠিত হয় বাহিরের গেলিয়া ও ভিতরের ল্যাসিনিয়া দিয়া। ল্যাসিনিয়া খাদ্য গ্রহণে সহায়তা করে।

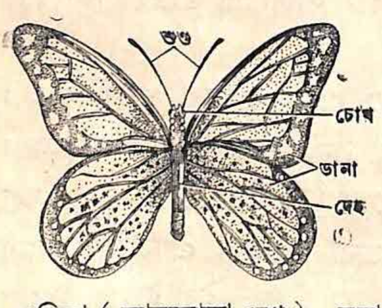
দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা বা লেবিয়াম বাহির হইতে দেখিলে একটি সম্পূর্ণ অঙ্গ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আসলে দুইটি দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা সামান্য যুক্ত হইয়া ইহা গঠিত হয়। ইহার তলদেশের দুইটি সন্ধির নাম সাবমেণ্টাম্ ও মেণ্টাম্। মেণ্টামের সহিত যুক্ত থাকে এক জোড়া চারসন্ধিযুক্ত লেবিয়াল প্যাল্প। একটি প্যারাগ্লসা ও গ্লসা লেবিয়াল প্যাল্পের ভিতরের দিকে থাকে।

বক্ষ—অন্য পতঙ্গের মত আরসোলার বক্ষে তিনটি খণ্ডক থাকে। ইহাদের নাম সামনে হইতে—পুরোবক্ষ, মধ্যবক্ষ ও পশ্চাদ্‌বক্ষ। পুরোবক্ষের টারজাম্ অন্য দুইটি খণ্ডকের টারজামের চেয়ে বড়। মধ্য ও পশ্চাদবক্ষে একজোড়া করিয়া ডানা থাকে। প্রথম ডানাজোড়া মোটা কাইটিনের ফলকের মত। পিছনে বিস্তৃত হইয়া ইহারা উদরের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ঢাকিয়া রাখে। ইহাদের এলিট্রা বলা হয়। দ্বিতীয় জোড়া ডানা নিশ্চল অবস্থায় যখন বক্ষের উপর শায়িত থাকে

তখন এলিট্রা তাহাদের আচ্ছাদিত করে। পতঙ্গটি যখন ওড়ে তখন এলিট্রা দেহের সহিত সমকোণ হইয়া দৃঢ়ভাবে তুইধারে প্রসারিত হয়। দ্বিতীয় জোড়া ডানা শুধু কাইটনের একটি অতি সূক্ষ্ম ভাঁজ। নানা শিরার শাখা-প্রশাখা ইহাকে সুগঠিত, দৃঢ় ও উড়িবার জন্য উপযোগী করে। যখন এই ডানা তুইটি ব্যবহার হয় না তখন আরসোলা ইহাদের এলিট্রার নীচে পাখার মত মুড়িয়া রাখে। স্ত্রী-আরসোলার এই ডানাগুলি অত্যন্ত ছোট হয়। বক্ষের প্রত্যেক খণ্ডকে একজোড়া করিয়া পা থাকে। প্রত্যেকটি পায়ে কতকগুলি সন্ধি থাকে ও ইহাদের প্রান্তে একজোড়া নখর থাকে।

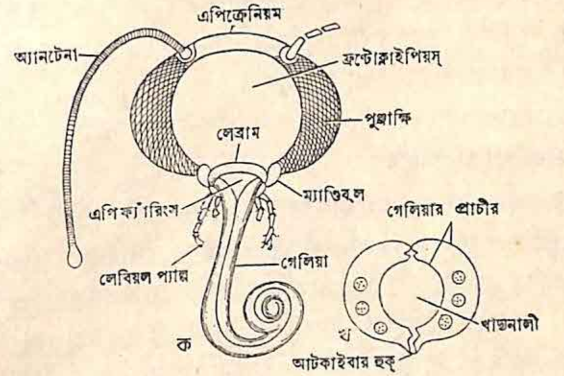
উদর—উদরের ১০টি অংশের মধ্যে ৮টিকে দেখা যায়। কারণ, ৮ ও ৯নং খণ্ড তুইটি ৭নং খণ্ডের টারজামের দ্বারা ঢাকা থাকে। শেষ টারজামটির পিছনের কানায় একটি সরু খাঁজ থাকে—ইহার নীচে পায়ু থাকে। এই খণ্ডটির তুইধারে সন্ধিবিশিষ্ট একটি সরু তকলির মত তুইটি অঙ্গ থাকে, তাহাদের নাম সারসাই। পুরুষ আরসোলার উদরের নবম খণ্ডে একজোড়া সূক্ষ্ম কাঁটা (style) থাকে। স্ত্রী-আরসোলার উদরের সপ্তম খণ্ডে নৌকার মত একটি উরুফলক থাকে।

প্রজাপতি—প্রজাপতি একটি পতঙ্গ। প্রজাপতির মাথা, বুক ও উদর তিনটিই পৃথক্ থাকে। সমস্ত দেহ ও উপাঙ্গগুলি চওড়া শল্কে ঢাকা থাকে। ছাদের টালির মত সামনের শল্কগুলি পিছনের শল্ককে সামান্য ঢাকিয়া রাখে। মাথার ধারে একটি করিয়া বড় পুঞ্জাক্ষি থাকে। একজোড়া সরু অ্যানটিনা থাকে এবং ইহাদের অগ্রভাগ সামান্য ফোলা। ম্যাণ্ডিব্‌ল থাকে না, কারণ চর্বণের প্রয়োজন হয় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রজাপতি মধু পান করে। এইজন্যে তাহার মুখাঙ্গ পরিবর্তিত হইয়াছে। ম্যাক্সিলার



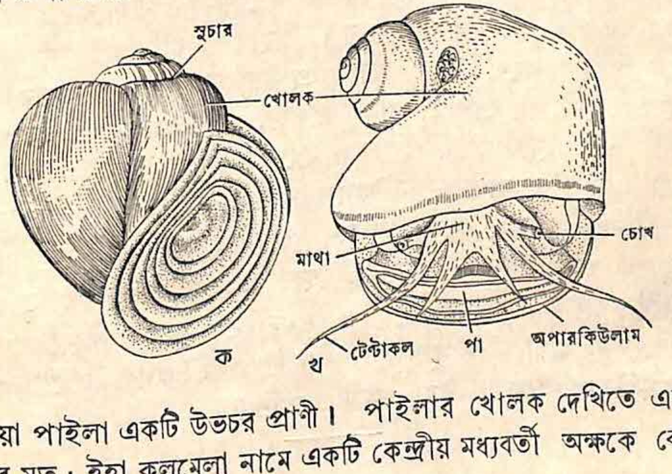
গেলিয়া (আরসোলা দেখ) লম্বা হয় ও ইহাদের ভিতরে একটি খাঁজ থাকে। ইহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয় অতি সূক্ষ্ম কতকগুলি হুকের দ্বারা (চিত্র-খ) ও এইভাবে সূক্ষ্ম নলের মত প্রোবোসিসটি

শোষণের জন্য গঠিত হয়। প্রজাপতির পুরোবক্ষ ও পশ্চাদ্‌বক্ষ ছোট হয় ও মধ্যবক্ষ হয় বড়। পুরোবক্ষ ও পশ্চাদ্‌বক্ষে লাগান থাকে তুইজোড়া পাতলা পরদার মত বড় ডানা। প্রসারিত অবস্থায় সামনের তুইটি ডানা



পিছনের ডানা তুইটিকে ঢাকিয়া রাখে। প্রতি বক্ষখণ্ডে একজোড়া করিয়া বহু খণ্ডবিশিষ্ট পা থাকে। পাগুলির ডগায় এক জোড়া করিয়া নখর থাকে। উদরের প্রথম খণ্ডকটি অন্য নয়টি অপেক্ষা ছোট। স্ত্রী-প্রজাপতির সপ্তম টারজামটি বড়, একটি জননরন্ধ্র দশম টারজামের নীচে থাকে। পুরুষ প্রজাপতির আছে একজোড়া ক্ল্যাসপার।

শামুক (জলশামুক), পাইলা—ইহাদের সাধারণতঃ পুকুরে, বিলে ও ধানক্ষেতে পাওয়া যায়। জলে ও ডাঙ্গায় থাকিতে পারে



বলিয়া পাইলা একটি উভচর প্রাণী। পাইলার খোলক দেখিতে একটি শঙ্কুর মত ; ইহা কলুমেলা নামে একটি কেন্দ্রীয় মধ্যবর্তী অক্ষকে বেষ্টন

করিয়া থাকে। খোলকটি সর্পিলাকারে গঠিত। একেবারে উপরের দিকে থাকে শীর্ষস্থানটি, এই অংশই প্রথমে গঠিত হয়। ইহার পর ক্রমবর্ধমান-ভাবে অন্য কুণ্ডলী গঠিত হয়। শেষ দুইটি সর্বাপেক্ষা বড় ও সমস্ত দেহকে ঢাকিয়া রাখে। দুইটি কুণ্ডলীর সংযোগ রেখার নাম সীবন। পাইলার দেহকে যে বৃহৎ কুণ্ডলী ঢাকিয়া রাখে তাহার একটি বড় ছিদ্র থাকে তাহাকে বলা হয় মুখ। এই ছিদ্র দিয়া সমস্ত দেহ বাহির হইয়া আসিতে পারে। ছিদ্রটি অপারকিউলাম নামক একটি চওড়া ঢাকনা দ্বারা ঢাকা থাকে।

পাইলার দেহে আছে মাথা, একটি চরণ ও ভিসেরাল মাস। যখন প্রাণীটি স্ফীত হয় তখন মাথা ও চরণ, খোলকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসে কিন্তু ভিসেরাল মাস খোলকের কুণ্ডলীর মধ্যে থাকে। মাথার সম্মুখের অংশটির নাম তুণ্ড (snout)। মাথায় দুইজোড়া কর্ষিকা বা টেন্টাকেল থাকে। কর্ষিকার পিছনে মাথার উপর একজোড়া চোখ আছে। মাথার নীচে একটি ত্রিকোণাকৃতি চরণ আছে। ইহার উপরের তলে অপারকিউলাম লাগানো থাকে। যখন চরণ ভিতরে টানিয়া লওয়া হয় তখন অপারকিউলাম খোলার মুখ বন্ধ করে। মাথার উপরে থাকে ভিসেরাল মাস। ইহার ভিতর ভিসেরাল মাস খোলকের সব কুণ্ডলীগুলি ভরিয়া দেয়, ইহাও খোলকের মত সর্পিল।

ম্যান্টল—ইহা ভিসেরাল মাসকে ঢাকিয়া রাখে। ম্যান্টলে দুইটি পুষ্ট অংশ থাকে তাহাদের নাম নিউক্যাল লোব। বাঁদিকের নিউক্যাল লোব একটি লম্বা নলের ন্যায়। ইহার দ্বারা প্রশ্বাসের বাতাস দেহে প্রবেশ করে, যখন স্থলের প্রাণীর মত পাইলার শ্বসন হয়। দেহ ও ম্যান্টলের মধ্যবর্তী স্থানটি প্রশস্ত, ইহাকে ম্যান্টল গহ্বর বলা হয়। এই গহ্বরে কতকগুলি অঙ্গ থাকে। মাথাটি ইহার মধ্যে টানিয়া লওয়া যায়। ডানদিকের নিউক্যাল লোবের নিকট একটি আলের মত এপিটিনিয়া থাকে; ইহার দক্ষিণে ও বামে যথাক্রমে থাকে ম্যান্টল গহ্বরের দুইটি অংশ—ব্রঙ্কিয়াল, গহ্বর ও ফুসফুস গহ্বর। ব্রঙ্কিয়াল গহ্বরে থাকে মলাশয়, পায়ু ও জননছিদ্র, ফুসফুস গহ্বরে থাকে, ম্যান্টলের দ্বারা গঠিত ফুসফুস। বামদিকে নিউক্যাল লোবে একটি উসফ্রেডিয়াম্ থাকে। ইহা একটি ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অঙ্কুরোদ্গমের শর্তাবলী ও পরীক্ষা

শুষ্ক বীজের মধ্যে ভ্রূণ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কোন কারণে বীজ ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে বহুবৎসর পরেও ইহাদের অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা থাকে।

শর্তাবলী—কয়েকটি শর্তের প্রভাবে বীজের সুপ্ত অবস্থা কাটিয়া গিয়া বিপাকীয় প্রক্রিয়া, দ্রুতভাবে আরম্ভ হয় এবং ভ্রূণমূল ডিম্বকরন্ধ্রের মধ্যদিয়া বাহিরে আসে। ইহাকে অঙ্কুরোদ্গম বলে। শর্তগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শর্তাবলী।

(ক) বাহ্যিক শর্তাবলী—ইহার মধ্যে তিনটি শর্ত খুবই প্রয়োজনীয়। যথা জল, অম্লজান এবং তাপ। অপর একটি শর্ত—আলো। অধিকাংশ বীজে প্রয়োজনীয় নহে।

(১) **জল**—ইহা একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। সুপ্ত বীজে জলের পরিমাণ অতি অল্প থাকায় বিপাকীয় ক্রিয়া খুব ধীরগতিতে হয়। উপযুক্ত পরিমাণ জল পাইলে বীজ স্ফীত হইয়া উঠে এবং বিপাকীয় প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে সুরু হয়। বীজে নিহিত শস্য বা বীজপত্রে খাদ্য কঠিন অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। জলের সাহায্যে কঠিন খাদ্য তরল খাদ্যে পরিণত হয়। ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য তরল খাদ্যের প্রয়োজন। এই তরল খাদ্য ভ্রূণে সংবাহিত হয় এবং ভ্রূণমূল ডিম্বকরন্ধ্রের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটায়। বিভিন্ন উদ্ভিদের বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়। কোন কোন উদ্ভিদের বীজ বপনের পূর্বে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

(২) **অম্লজান**—বীজ একটি সজীব বস্তু বলিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য শক্তির প্রয়োজন। শ্বাসকার্যের দ্বারা বীজ, বায়ু হইতে প্রয়োজনীয় অম্লজান গ্রহণ করে। বীজপত্রে অথবা শস্যে সঞ্চিত খাদ্য অম্লজানের সাহায্যে জারিত হইয়া শক্তি উৎপন্ন করে।

এই শক্তি বীজের বিভিন্ন বিপাকীয় প্রক্রিয়া চালনা করে। ইহার ফলে অঙ্কুরোদ্গম হয়।

(৩) **তাপ**—অঙ্কুরোদ্গমের জন্য তাপের প্রয়োজন। সাধারণতঃ অধিকাংশ বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য স্বাভাবিক তাপমাত্রা অর্থাৎ ২৫° সেন্টিগ্রেড হইতে ৩০° সেন্টিগ্রেড প্রয়োজন হয়। অত্যধিক কম অর্থাৎ ৫° সেন্টিগ্রেড ও অত্যধিক বেশী অর্থাৎ ৪৮° সেন্টিগ্রেড অপেক্ষা বেশী অঙ্কুরোদ্গম হয় না।

(৪) **আলো**—অনেক রকমের বীজের অঙ্কুরোদ্গম অন্ধকারেই হয় যেমন, টম্যাটো। তবে সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে যে, অধিকাংশ বীজের অঙ্কুরোদ্গম আলোর প্রভাবে ভালভাবে হয়। কোন কোন বীজের অঙ্কুরোদ্গমে আলো একটি প্রয়োজনীয় শর্ত, যেমন, পালং।

(খ) **আভ্যন্তরীণ শর্তাবলী**—

(১) **খাদ্য**—ইহা স্থৈতিক শক্তি এবং গতিশক্তি হইতে উৎপন্ন হয়, যাহা অঙ্কুরোদ্গম ঘটায়। সুতরাং এই শক্তির জন্য বীজের মধ্যে যথেষ্ট খাদ্য থাকা প্রয়োজন।

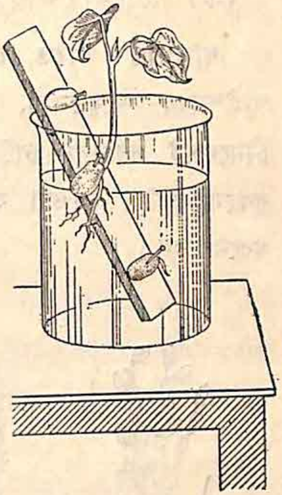
(২) **সুপ্ত অবস্থা**—প্রত্যেকটি বীজকেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সুপ্ত অবস্থায় থাকিতে হয়। এই সময় বিভিন্ন বীজে বিভিন্ন রকমের হয়। অঙ্কুরোদ্গমের জন্য যে ক্ষমতা দরকার তাহা লাভ করিবার জন্য বীজকে সুপ্ত অবস্থায় থাকিতে হয়।

(৩) **অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা**—বিভিন্ন বীজে এই ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য থাকে। এই ক্ষমতা ভ্রূণের বাঁচিয়া থাকার উপর নির্ভর করে।

অঙ্কুরোদ্গমের পরীক্ষা—বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য তিনটি বাহ্যিক শক্তি যে প্রয়োজনীয় তাহা নিম্নে একটি পরীক্ষার দ্বারা দেখান হইতেছে। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছ যে, ভিজা আলগা মাটিতে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় মাঠে বীজ বপন করা হয়।

পরীক্ষা—স্কেলের ন্যায় তিনটি কাঠের টুকরা লওয়া হইল। প্রত্যেকটি কাঠের টুকরায় একটি করিয়া তিনটি ছোলা বীজ আট ইঞ্চি

অন্তর পিনের সাহায্যে আটকাইয়া দেওয়া হইল। বীজসহ প্রত্যেকটি কাঠের টুকরাকে পৃথক পৃথক বীকারের মধ্যে তির্যকভাবে রাখা হইল।



এইবার প্রত্যেকটি বীকারে এমনভাবে জল ঢালা হইল যাহাতে নীচের বীজটি জলের তলায় এবং মাঝখানের বীজটি কিছুটা জলের তলায় ডুবিয়া যায়। ইহার পর একটি বীকারকে স্বাভাবিক তাপমাত্রায়, একটি বীকারকে বরফের মধ্যে এবং একটি বীকারকে ফুটন্ত জলের মধ্যে রাখা হইল।

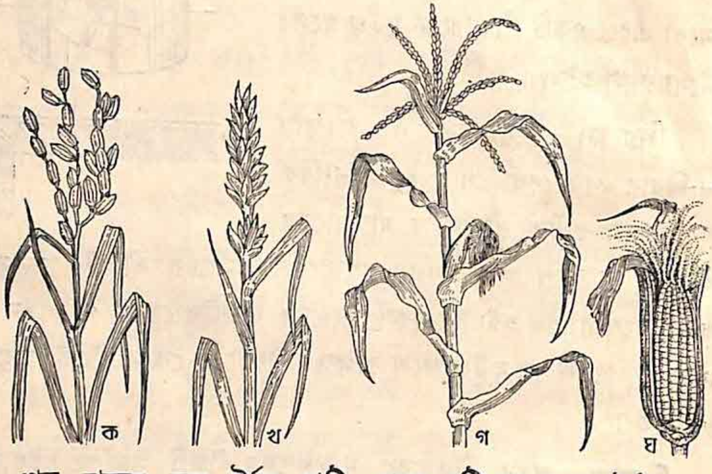
নিরীক্ষা—কয়েকদিন ঐ অবস্থায় রাখিবার পর দেখা গেল যে, স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বর্ধিত বীকারের মাঝখানের বীজটির ভ্রূণরূপে অঙ্কুরোদগম হইয়াছে। নীচের বীজটির ভ্রূণমূলের অল্প অংশ বাহির হইয়াছে কিন্তু উপরের বীজটির কোন পরিবর্তন হয় নাই। বরফে ও ফুটন্ত জলে রক্ষিত বীকারের কোন বীজই অঙ্কুরিত হয় নাই।

সিদ্ধান্ত—প্রথম বীকারের মাঝখানের বীজটি অঙ্কুরিত হইয়াছে। কেননা, সেখানে সকল শর্তই যথা, জল, অম্লজান ও তাপ বিদ্যমান। নীচের বীজটি জল ও তাপ পাওয়ার ফলে কিছুটা অঙ্কুরিত হইয়াছিল কিন্তু অম্লজানের অভাবে অঙ্কুরোদ্গম সম্পূর্ণ হয় নাই। জলের বাহিরে অবস্থিত বীজটি কেবলমাত্র অম্লজান ও তাপ পাইয়াছিল বলিয়া একেবারেই অঙ্কুরিত হয় নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বীকারের কোন বীজই অঙ্কুরিত হয় নাই। উপরোক্ত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য জল, অম্লজান ও তাপের প্রয়োজন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(ক) প্রয়োজনীয় ও অর্থকরী উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ধানগাছ—ভারত, চীন, জাপান, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপিন প্রভৃতি দেশে চাউল প্রধান খাদ্য। চীনদেশই সর্বপ্রথম চাউল উৎপাদন করে। ভারতে প্রায় ১১০০ রকমের চাউল পাওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ, আকার ও গন্ধ বিভিন্ন ধরনের হয়।



ধান চাষের জন্য উর্বর মাটি, প্রচুর বৃষ্টিপাত ও যথেষ্ট উত্তাপের প্রয়োজন। ধানগাছ বাড়িবার সময় মাঠে জল থাকিলে ভাল হয়। পশ্চিমবঙ্গে ধান প্রধানতঃ তিন প্রকার—যথা, আমন, আউস ও বোরো। পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন ধানের বেশীর ভাগই আমন এবং ইহা সর্বাপেক্ষা ভাল। ধান কেবল রৌদ্রে শুকাইয়া ভাঙ্গিয়া লইলেই আতপ চাউল হয়। ধান প্রথমে সিদ্ধ করিবার পর শুকাইয়া ভাঙ্গিয়া লইলে সিদ্ধচাউল হয়। ঢেকিছাঁটা চাউল সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কেন না, ইহাতে খাদ্যের গুণ বেশী পরিমাণে থাকে। চাউলে আমিষ উপাদানের পরিমাণ গমের চেয়ে কম, কিন্তু ইহার আমিষ উপাদান গম অপেক্ষা পুষ্টিকর। ইহার প্রধান উপাদান শ্বেতসার।

চাউল হইতে উৎপন্ন ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য হইলেও ইহা হইতে অন্যান্য খাদ্য তৈয়ারী করা হয়, যেমন, চালভাজা, মুড়ি, পিঠা, খই, চিড়া, পায়েস ইত্যাদি। চালের ভ্রূণ হইতে তৈল হয়। খুদ হইতে শ্বেতসার তৈয়ারী হয়। ভাত পচাইয়া মদ্য তৈয়ারী হয়। খড় হইতে টুপি, জুতা প্রভৃতি অন্যান্য জিনিস তৈয়ারী হয়। গ্রামাঞ্চলে খড় দিয়া বাড়ীর চাল ছাওয়া হয়। ভুষি এবং খড় গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

গম—শুষ্ক নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে দো-আঁশ মাটিতে গমের চাষ হয়। শীতকালীন গমের ফলন বসন্তকালীন গমের ফলনের চেয়ে বেশী হয়। ছোট দানাযুক্ত গমে আমিষজাতীয় উপাদান বেশী থাকে। বড় দানাযুক্ত গমে শ্বেতসার বেশী থাকে।

গম হইতে সাধারণতঃ আটা, ময়দা, সুজি উৎপাদিত হয়। আটা ও ময়দা হইতে রুটি বা পাউরুটি প্রস্তুত হয়। ময়দা দিয়া কেক, বিস্কুট, সিমাই প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। মদ্য তৈয়ারীর জন্য গম ব্যবহৃত হয়। খড় ও ভুষি গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। গমের খড় কার্পেট, ঝুড়ি, দড়ি ইত্যাদি তৈয়ারীর কাজে লাগে। প্যাকিং বাক্সেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

ভুট্টা—উত্তর-ভারতে ভুট্টার চাষ হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকা ভুট্টার প্রধান উৎপাদক দেশ। ইহা একবীজপত্রী উদ্ভিদের অন্তর্গত। নানা জাতের ভুট্টা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ গরম কালে হয়। ভুট্টা গবাদি পশুর প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

যব—পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের যব পাওয়া যায়। ইহার যথেষ্ট খাদ্যগুণ রহিয়াছে। ইহা প্রধানতঃ গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যব হইতে বার্লি হয়। মদ্য তৈয়ারী করিতে বার্লি লাগে।

ডাল জাতীয় গাছ—বীজের বীজপত্র খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ডাল বলা হয়। ইহাতে প্রোটিনের পরিমাণ অনেক বেশী থাকে। ইহাতে এ, বি ও সি ভিটামিন পাওয়া পাওয়া যায়। ইহারা সবুজ

সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ শীতকালে ডালের চাষ করা হয়। ইহা রবিশস্য নামেও পরিচিত। এখানে কয়েকরকম ডালগাছের আলোচনা করা হইতেছে।

মসুর গাছ—উত্তর ও পূর্ব-ভারতে প্রধান খাদ্যের সহিত ইহা প্রয়োজনীয় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই বীজপত্র দ্বারা নানাপ্রকার খাদ্য তৈয়ারী হয়, যেমন ডাল, বড়ি, বড়া প্রভৃতি। মাংস হইতে ইহা সহজপাচ্য। এই গাছের কাণ্ড ও পাতা গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

মুগ গাছ—প্রধানতঃ চীন, ভারত ও আমেরিকায় ইহার চাষ হয়। ইহার বীজগুলি ডিম্বাকার। ইহাতে বহুল পরিমাণে খাদ্যগুণ রহিয়াছে। সাধারণতঃ ডাল হিসাবে ইহা খাওয়া হয়।

মাসকলাই—ইহা মাটির উপর লতাইয়া থাকে। ইহা উৎকৃষ্ট রবিশস্য। ভারতে ইহার চাষ হয়। বীজের ত্বকটির বর্ণ ঘন খয়েরী। বীজপত্র সহজপাচ্য। এই বীজপত্র দ্বারা ডাল, পিঠা ও পাঁপড় তৈয়ারী হয়। বীজ এবং কাণ্ড গবাদিপশুর খাদ্য।

অড়হর গাছ—ইহা প্রধানতঃ ভারত, ইস্ট ইণ্ডিজ্ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজে চাষ হয়। প্রায় ত্রিশ রকমের অড়হর পাওয়া যায়। ইহা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। প্রাচীনকাল হইতে পরিপক্ব এবং অপরিপক্ব বীজ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দক্ষিণ-ভারতে ইহা প্রধান খাদ্য। ইহার বীজপত্রের দ্বারা ডাল, পিঠা প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। কচিফলও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা গবাদিপশুর খাদ্য।

ছোলা গাছ—উত্তর-ভারতের সর্বত্রই ইহার চাষ হয়। শুষ্ক আবহাওয়া ফলনের পক্ষে ভাল এবং তিন মাসেই ফলন হয়। ইহাতে অন্যান্য ডাল অপেক্ষা স্নেহজাতীয় খাদ্যগুণ বেশী থাকে। ইহার বীজপত্রের দ্বারা ডাল ও অন্যান্য খাদ্য তৈয়ারী হয়। ছোলা ভিজাইয়া বা ভাজিয়া খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক বীজ পিষিয়া ব্যসন

এবং ভাজা বীজ পিষিয়া ছাতু তৈয়ারী হয়। অপরিপক্ক বীজও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

মটর গাছ—উত্তর ও পূর্ব-ভারতে, আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ইহার চাষ হয়। ইহার বীজপত্রের দ্বারা ডাল ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। অপরিপক্ক বীজ তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয় এবং খাইতে সুস্বাদু। কাণ্ড ও পাতা গবাদিপশুর খাদ্য।

সয়াবীন গাছ—ভারতে মাত্র ৭০-৮০ বৎসর ইহার চাষ হইতেছে। বর্তমানে উত্তর ও মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও রাজস্থানে ইহার চাষ হইতেছে। অন্যান্য ডালের চেয়ে প্রোটিন এবং স্নেহজাতীয় গুণের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী। শ্বেতসারের পরিমাণ অনেক কম। নানা ধরনের খাদ্য ইহার বীজের দ্বারা তৈয়ারী হয়, যেমন ডাল, আটা, তরকারি, দুধ, দই, সন্দেশ, পনির, বিস্কুট, তৈল ইত্যাদি। ইহার বীজ নানা শিল্পে ব্যবহৃত হয়, যেমন, সাবান, রং, বার্নিশ, বাতি প্রভৃতি। অগ্নি নির্বাপণেও ইহা কাজে লাগে।



পাটগাছ—পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশে পাটের চাষ হয়। ইহা দুই জাতের হয়, যথা, তিতা ও মিঠা পাট। সরস দোআঁশলা মাটি, বর্ষার বৃষ্টি ও ভ্যাপসা গরম পাট চাষের পক্ষে ভাল। ইহা সাধারণতঃ ৮ হইতে ১০ ফুট লম্বা হয়। ইহার কাণ্ড সরু হয়। ফুল ফুটিবার পরই পাটগাছ কাটা হইলে উৎকৃষ্ট তন্তু পাওয়া যায়। ১০ হইতে ১৫ দিন জলের মধ্যে পাটগাছগুলিকে ভিজাইয়া রাখা হয়। তাহার পর হাতের সাহায্যে

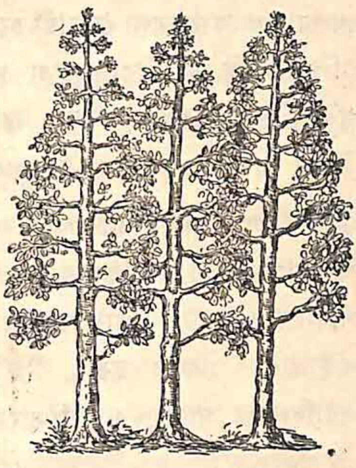
তন্তুগুলিকে বাহির করা হয়। পরে ইহা ভাল করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। পাটজাত বস্তু খুবই সুলভ। পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্পের বিশেষভাবে উন্নতি হইয়াছে। পাটজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করা হয়। ইহার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার জিনিস তৈয়ারী হয়, যেমন, থলি, চট, কার্পেট, পর্দা, কম্বল ইত্যাদি।

তুলাগাছ—ভারতেই প্রথম তূলাগাছের চাষ শুরু হয়। এইখানেই বিশ্ববিখ্যাত মসলিন তৈয়ারী হইত। পৃথিবীতে তূলা উৎপাদনে ভারত চতুর্থ। ভারতে গুজরাট, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র প্রধান উৎপাদক। তবে অন্যান্য রাজ্যেও তূলা চাষ হয়। নানাপ্রকারের তূলা গাছ পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণতঃ গুল্ম অথবা ছোট ছোট বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। ইহা গ্রীষ্মমণ্ডলের ফসল। সাধারণতঃ স্যাঁতসেতে মাটিতে তূলাগাছ হয়। বীজের সূক্ষ্মরোম হইতে তূলা উৎপন্ন হয়। তূলাগাছের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জিনিস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। শিল্পে ইহার স্থান অদ্বিতীয়। তূলা হইতে জামা, কাপড়, সূতা, দড়ি, কার্পেট, পর্দা, বালিশ, তোশক, লেপ প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। ইহার বীজ হইতে তৈল ও খোল উৎপন্ন হয়। কাণ্ডজাত সূতা কাগজশিল্পে ব্যবহৃত হয়। মূল ঔষধ তৈয়ারীর কাজে লাগে।



শালগাছ—পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশে প্রধানতঃ শালের জঙ্গল রহিয়াছে। ইহা দ্বিবীজপত্রী এবং

বৃক্ষ জাতীয়। ইহা লম্বায় সাধারণতঃ ৭০-৭৫ ফিট হয়। ইহার কাঠ খুব শক্ত ; ভারী ও টেকসই হয়। এই কাঠ দ্বারা রেলের স্লীপার, থাম, তক্তা, দরজা, জানালা, নৌকার পাটাতন, ব্রীজ, চাকা প্রভৃতি তৈয়ারী হয়।



নারিকেল গাছ—সমুদ্রের তীরে ইহার উপযুক্ত পরিবেশ। প্রত্যেক গাছে সাধারণতঃ ৬০ হইতে ৮০টি নারিকেল হয়। ফুল ফোটা হইতে নারিকেল ঝুনা হওয়া পর্যন্ত ১ বৎসর সময় লাগে। এই গাছের প্রতিটি অংশই কাজে লাগে। শাঁস নারিকেলের শস্য। স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ইহাতে খুব বেশী পরিমাণে থাকে। শাঁস, মিষ্টান্ন ও নানাপ্রকার তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। শাঁস শুকাইয়া কবরা তৈয়ারী হয় এবং ইহা হইতে তৈল উৎপাদিত হয়। এই তৈল রন্ধনে, বনস্পতি ও সাবান উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রসাধন দ্রব্য, তৈল, শাম্পু, মার্গারিণ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার ছোবড়া হইতে



দড়ি, গদি, পাপস ও মালা হইতে হুকার খোল, নানা ধরনের খেলনা ও কাঠকয়লা তৈয়ারী হয়। পাতার দ্বারা মাদুর, পর্দা, ঝুড়ি, টুপি ইত্যাদি, মধ্যশিরার দ্বারা ঝাঁটা ও বেত এবং কাণ্ডের দ্বারা খুঁটি তৈয়ারী হয়। পাতা ঘর ছাওয়ার কাজে লাগে। ইহার জল উৎকৃষ্ট পানীয়। ইহার খইল গবাদিপশুর খাদ্য।

সরিষা গাছ—এই গাছ কয়েক প্রকারের হয়। ইহার চাষ শীতকালে হয়। সরিষা বীজ হইতে তৈল উৎপাদিত হয়। ইহা সাধারণতঃ রন্ধনে ব্যবহৃত হয়। গায়ে ও মাথায় মাখার কাজে এই তৈল ব্যবহৃত হয়। বীজ হইতে যে খৈল উৎপন্ন হয় তাহা গবাদিপশুর খাদ্য ও সার হিসাবে কাজে লাগে।

(খ) প্রয়োজনীয় ও অর্থকরী প্রাণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সুস্বাদু মাছের মধ্যে নিম্নলিখিত মাছগুলি প্রধান—নদী ও পুকুরের রুই, কাতলা, কালবোস, বাটা, মৃগেল। এই শ্রেণীর প্রাপ্তবয়স্ক মাছ সাধারণতঃ শাকাহারী হয়। কই, মাগুর, সিঙ্গিকে বলা হয় জিয়ল মাছ। কতকগুলি মাছ মাংসাশী, যথা, শোল, ল্যাটা, বোয়াল, সাল প্রভৃতি। এই মাছগুলি অপেক্ষাকৃত সস্তা। মাংসাশী মাছের মধ্যে চিতল মাছ সুস্বাদু ও প্রসিদ্ধ। এই সকল মাছ অনেক টাটকা জলের মাছ খাইয়া ফেলিয়া মাছের চাষের খুব ক্ষতি করে। সেইজন্য রুই, কাতলা ও মৃগেল প্রভৃতি মাছ এই সকল মাংসাশী মাছের সহিত রাখা হয় না। পুকুরে ত্রিচোখ ও মউরলা মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অ্যানোফিলিস মশা ধ্বংসকারী মাছ জলে রাখিলে ম্যালেরিয়া অনেকটা নিবারণ করা যায়। ত্রিচোখ মাছ জলে ছাড়িয়া দিলে মশার লার্ভা ধ্বংস হয়। সুন্দরবনে নদীর মোহনায় ইলিশ, খয়রা, পার্শে ভেটকি, ভাঙ্গর প্রভৃতি মাছ প্রচুর পরিমাণে

পাওয়া যায়। ইলিশ, নদী মোহনায় জন্মায় এবং পদ্মায় ও গঙ্গায় আসে। এইরূপ অত্যন্ত সুস্বাদু অন্য একটি মাছ পায়রা-চাঁদা। শতকরা ৫০ ভাগ ভারতবাসীর (বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু ও কেরালায়) মাছ প্রধান খাদ্য, কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাথাপিছু ২ আউন্স মাছও আমরা পাই না।

ফিসারী—এই স্থানে মাছের চাষ ও ব্যবসা করা হয়। মাছ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণাও এইখানে হয়।

রুই, কাতলা মাছ বদ্ধজলে ডিম পাড়ে না। এইজন্য মাছগুলির চাষ করা হয় একটি নদী বিপরীত দিকে চালাইয়া দিয়া সেই জলে—এই স্থানটিকে বলা হয় ইনল্যাণ্ড ফিসারী। যাহাতে এ মাছগুলি নদীতে আবার প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য একটি বাঁধ প্রস্তুত করা হয়। কলিকাতার কাছে ইনল্যাণ্ড ।ফসারীতে গবেষণা করা ও শিক্ষা দেওয়া হয় (সেণ্ট্রাল ইনল্যাণ্ড ফিসারিস্, ইনস্টিটিউট, বারাকপুর)। যে জমিতে মাছের চাষ করা হয় তাহা যখন শুকনা থাকে তখন বর্ষা নামিবার আগে মাটি প্রস্তুত করিতে হয়। এই মাটি লাঙ্গল দিয়া চাষ করিবার পূর্বে নানা আগাছা সাফ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই মাটিতে ধান উৎপন্ন করা হয়। উৎপন্ন ধান কাটিয়া লইলে কিছু খড় মাটিতে থাকে—এই খড় নদীর জলে পচান হয়। নানা জলজ উদ্ভিদ বিশেষতঃ শৈবালের বৃদ্ধি এই জলে হয়। নানা ক্ষুদ্রপ্রাণীও দেখা যায়—যথা, এককোষী প্রাণী, ছোট কেঁচো, শামুক প্রভৃতি। নানা উদ্ভিদ ও ছোট ছোট প্রাণী থাকায় যেমন পুকুরে প্রচুর মাছ জন্মায় তেমনি এই স্থানেও মাছের জন্য প্রচুর খাদ্য থাকে। বাংলা দেশে যে ফিসারীগুলিতে মাছের চাষ করা হয় মাছ বিক্রয় করিয়া লাভ করিবার জন্য তাহাদের ভেরি বলা হয়। ভেড়িতে মাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছানা (পোনা) ভেড়ির জলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রতি বৎসরে গ্রীষ্মকালে ভেড়ি পুনরায় তৈরী করিতে হয়।

মাছের নানা ব্যবহার ঃ মাছ অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। মাছে প্রায়

শতকরা ১৮ ভাগ প্রোটিন ও ৮ ভাগ স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে। রুই মাছে অপেক্ষাকৃত তৈলাক্ত পদার্থ বেশী থাকে তাই সহজপাচ্য নয়। রোগীর জন্য মাগুর, শিংগী, কই মাছের ব্যবস্থা হয়—শতকরা এক ভাগের চেয়েও কম স্নেহজাতীয় পদার্থ এই সব মাছে থাকায় ইহা সুপাচ্য। মাছ সংরক্ষণের জন্য শুকাইয়া বা লবণে জারাইয়া রাখা হয় ও খাদ্যের জন্যে নানাস্থানে চালান হয়। ইহাকে শুঁটকি মাছ বলা হয়।

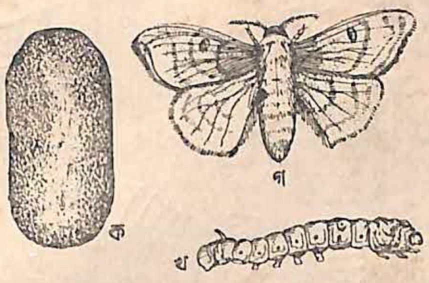
(২) **মাছের তেল**—হাঙ্গরের লিভারের তেল ও সার্ডিনের তেল। ভারতে ব্যবসায়ের জন্য ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। তেল ব্যবহার করা হয়—রং, নরম সাবান প্রস্তুতের জন্য, চামড়া নরম করিবার জন্য, ইস্পাতে পান দিবার জন্য ও খাদ্যের জন্য ও পাট ব্যবসায়ের জন্য। মাছের তেলে দুইটি অত্যন্ত মূল্যবান ভাইটামিন থাকে, যথা ভাইটামিন এ ও ডি। ক্ষয় রোগে, চোখের রোগে, চামড়ার নানা ব্যাধিতে এই তেল অপরিহার্য। এই তেলটি তামিলনাডু, মহারাষ্ট্র ও কেরালায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কেরালায় একটি গভর্ণমেণ্ট শার্কলিভারের তেলের কারখানা আছে।

আইজিংগ্লাস—আটা, জেলী প্রস্তুতের জন্য, মদকে পরিষ্কারের জন্য, ডিম সংরক্ষণে ইহার ব্যবহার হয়। ইহা উৎপন্ন হয় বম্বে, তামিলনাডু ও সুন্দরবনে। ফিসমিল—মাছের পরিত্যক্ত অংশ শুকাইয়া হাঁস, মুরগী প্রভৃতির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সার—মাছের পরিত্যক্ত অংশকে পচাইয়া গাছের সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

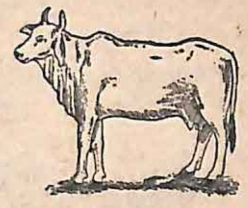
পোলট্রি—যে সকল গৃহপালিত পাখি দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে ও যাহাদের বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করা হয় তাহাদের পোলট্রি বলা হয়। যথা, মুরগী, টারকী, হাঁস, গিজ, গিনিফাউল, পিফাউল, পায়রা প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে মুরগী। ভারতে পোলট্রি উৎপন্নের ১২·৬% হয় পশ্চিমবঙ্গে।

মুরগী—আমাদের দেশে গৃহপালিত মুরগী দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা, দেশী বা স্থানীয় ও বিদেশ হইতে আমদানী করা।

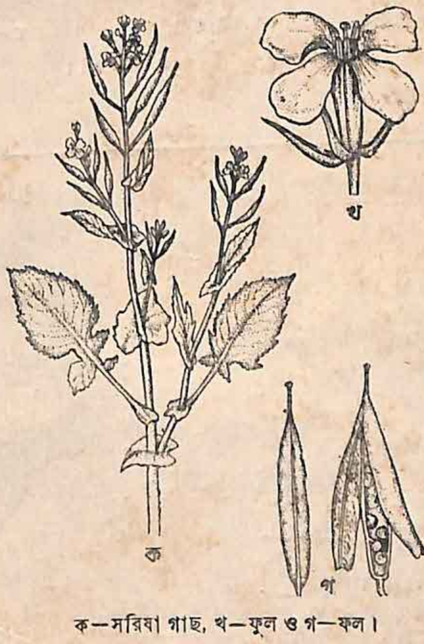
বিভিন্ন অর্থকরী প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী



ক—রেশম গুটি, খ—শুককীট, গ—রেশম মথ



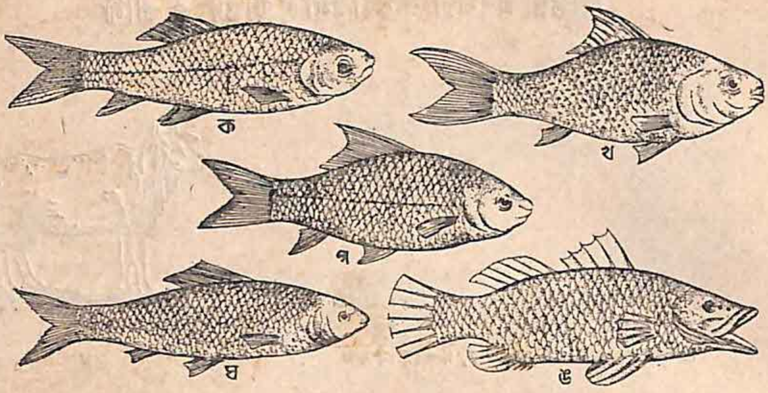
গরু



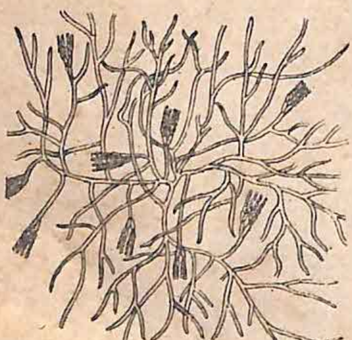
ক—সরিষা গাছ, খ—ফুল ও গ—ফল।



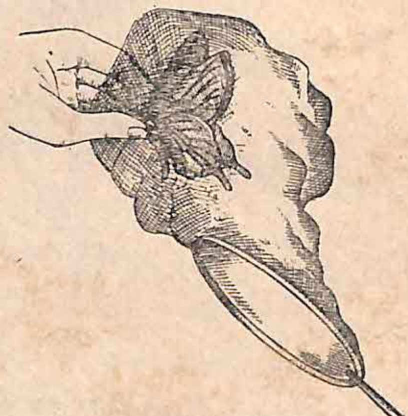
ক—মোরগ, খ—মুরগী, গ—হাঁস।



ক—রুই, খ—কাতলা, গ—কালবোস,
ঘ—মৃগেল, ঙ—ভেটকী।



পেনিসিলিন গাছ।



পতঙ্গ ধরিবার জাল
(প্রজাপতি ধরা হয়েছে।)

নানাজাতের মুরগীর মিশ্রণের ফলে দেশী মুরগী উৎপন্ন হইয়াছে। যে সকল বিদেশী মুরগী বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে তাহারা হোয়াইট লেগহর্ণ ও রোড অ্যাইল্যাণ্ড রেড্। অন্য জাতের মুরগীও আছে, যেমন, ব্ল্যাক মিনর্‌কা, প্লাইমাউথ রক্, অস্ট্রালোর্প, নিউহ্যাম-সায়ার, লাইট সাসেক্স ব্রাউন, লেগ-হর্ণ প্রভৃতি। মানুষের খাদ্যশস্যই মুরগীর প্রধান খাদ্য।

হাঁস—তামিলনাডু ও পশ্চিমবঙ্গে ভারতের হাঁসের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আছে। ভারতের হাঁস মাথাপিছু ৯০ হইতে ১০০টি ডিম পাড়ে। হাঁস ও মুরগী প্রভৃতি পোলট্রি পালন করা হয় প্রধানতঃ তাহাদের মাংস ও ডিমের জন্য। এই সব পাখির পালকে নরম বালিশ, টুপি, ঝাড়ন, মাছ ধরিবার ছিপের ফাতনা প্রভৃতি তৈরী হয়।

গোরু—ভারতীয় গরু অপেক্ষা প্রতীচ্যের গরু বেশী দুধ দেয়, কিন্তু ভারতের গরু অনেক বেশী কর্মঠ। উৎকৃষ্ট জাতের গরু পাওয়া যায় তামিলনাডুর কোন কোন স্থানে, মহীশূর, অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রে। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টজাতের গরু বাস করে উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে। ভারতের গরুকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়।

(ক) উৎকৃষ্ট দুগ্ধদানের ক্ষমতা ডেয়ারীব্রিড বা দুধেল জাত সুরাও শাহীওয়াল (পাঞ্জাব), লাল সিন্ধী (সিন্ধুদেশ)। (খ) মোটামুটি ভাল দুগ্ধদানের ক্ষমতা ও কর্মঠ, হরিয়ানা (হরিয়ানা অঞ্চলের গরু), থরপারকর (সিন্ধুদেশের গরু)। (গ) কম দুধ দেয় কিন্তু কর্মঠ হাল্লীকর ও অমৃতমহাল (মহীশূর), কাঙ্গাইয়াম (কম্বাটোর), মালবী (মধ্যভারত)।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন গোশালায় হরিয়ানা জাতের গরু পালন করেন ও বিহার সরকারের গোশালায় থরপারকর জাতের গোরু রাখা হয়। স্থানীয় গরু অপেক্ষা এইসকল গরু অনেক উৎকৃষ্ট।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খাদ্য

স্টীম ইঞ্জিনকে যখন ছুটিতে দেখি তখন তাহার প্রচণ্ড শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য হই। তখন মনে হয় এই শক্তি কোথা হইতে আসে? চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রচুর কয়লা পোড়ানোর জন্য এই প্রচণ্ড তাপরূপ শক্তি উৎপন্ন হয় ও আলাদিনের দৈত্যের মত প্রায় অসম্ভব কর্মকে সম্ভব করিতে পারে। আমরাও



প্রতি মুহূর্তে নানারূপ কর্ম করিয়া শক্তির ব্যবহার করি এবং দৈনন্দিন যে খাদ্য খাই তাহা হইতে ঐ শক্তি পাই। ইঞ্জিনের কয়লায় অধিক পরিমাণে অঙ্গার বা কারবন থাকে, ইহা দগ্ধ হইয়া শক্তি উৎপন্ন হয়। সেইরূপ আমাদের প্রধান খাদ্যগুলিতে অঙ্গার থাকে ও দেহের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অঙ্গারের দাহক্রিয়া ঘটিয়া তাপের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমাদের জীবন্ত দেহ প্রাণহীন জড় ইঞ্জিনের অপেক্ষা অধিক

কাজ করে—দেহের ক্ষয় হইলে খাদ্যে কতকগুলি উপাদানের সাহায্যে দেহের কোষগুলি সেই ক্ষতিপূরণ করিয়া দেহের ভাঙ্গন রোধ করে। খাদ্য দেহের বৃদ্ধিরও সহায়তা করে (যেমন শিশুদের দেহে)। ইঞ্জিন প্রাণহীন বলিয়া শেষোক্ত দুইটি জৈবিক প্রক্রিয়া করিতে পারে না।

খাদ্যে ছয়টি প্রধান উপাদান আছে : (i) শ্বেতসার জাতীয় (ii) আমিষ জাতীয় (iii) স্নেহ জাতীয় (iv) ভাইটামিন (v) জল ও ধাতব লবণ।

এইখানে প্রথম তিনটি প্রধান খাদ্যের বর্ণনা করা হইবে। শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ আমাদের বিশেষ পরিচিত। এই খাদ্যে আছে কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। একটি কার্বোহাইড্রেট অণুতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে সেই অনুপাতে, যে অনুপাতে ইহারা জলে থাকে। কিছু শ্বেতসার (ভাত, রুটি) টেস্টটিউবে গরম করিলে একটু পরে দেখিবে পুড়িয়া কাল অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, এই সকল খাদ্যে অঙ্গার বা কারবনই মূল পদার্থ। আমরা কার্বোহাইড্রেটকে এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি। যথা :

শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ তিন প্রকার, যথা : (i) বহুশর্করা (ii) দ্বিশর্করা (iii) একশর্করা। চারিপ্রকার বহুশর্করা আছে, যথা : (ক) সেলুলোজ (খ) শ্বেতসার (গ) গ্লাইকোজেন (জৈব শ্বেতসার) (ঘ) ডেক্সিট্রিন। তিনপ্রকার দ্বিশর্করা আছে, যথা : ইক্ষুশর্করা (সুক্রোজ), মল্ট শর্করা (মল্টোজ), দুগ্ধ শর্করা (ল্যাক্টোজ)। তিনপ্রকার একশর্করা আছে, যথা : গ্লুকোজ বা আঙ্গুরের চিনি, সেলুলোজ বা ফলশর্করা, গ্যালাক্টোজ।

অপরিণত উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর সেলুলোজ বলিয়া পদার্থের দ্বারা গঠিত। সেলুলোজ প্রাণীর দেহে থাকে না। কারণ প্রাণিদেহে সেলুলোজ প্রস্তুত হয় না। সেলুলোজ যকৃতে গিয়া অবিকৃত অবস্থায় বাহির হইয়া আসে। আমরা নানাপ্রকার তরিতরকারি যেমন, বাঁধাকপি, নটেশাক, পটল, ঝিঙ্গে, বিন, বরবটি প্রভৃতি খাই সেগুলি

গরুর নানা উপকারিতা। গো পালন প্রধানতঃ দুধের জন্য, গাড়ি-টানার জন্য করা হয়। বলদ জমিতে চাষ করে। গোবর ও হাড়ের গুঁড়া জমির সারের জন্য উৎকৃষ্ট। উপরন্তু গোবর শুকাইয়া জ্বালানী-রূপে ব্যবহারের বিষয় সকলেই জানেন। গোরুর চামড়ায় জুতা ও অন্য অনেক জিনিস প্রস্তুত হয়। গোরুর শিং গালাইয়া শিরীষের আঠা করা হয়। গরুর যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, অণ্ডাশয় প্রভৃতি হইতে মূল্যবান ঔষধ প্রস্তুত হয়। গরুর মাংস কোনও কোনও লোকের খাদ্য।

দুধের সমস্যা—যতই মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে ততই শিশুদের এই অত্যন্ত মূল্যবান খাদ্যে টান পড়িতেছে। সমস্যাটি ভয়াবহ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানা উপায়ে এই সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হইয়াছেন। শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকে যেমন বলা হয় সবুজ বিপ্লব, দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিকে আজকাল শ্বেতবিপ্লব বলা হইতেছে।

রেশমকীট (রেশমগুটি)—মানুষের উপকারী পতঙ্গের মধ্যে সিল্ক ওয়ারম বা রেশমের কীট বা গুটিপোকা অন্যতম। রেশম কীট মালবেরী পাতা খায়। এই গাছের টাটকা পাতা ও ডালপালা প্রত্যহ চাষের ঘরে আনিয়া কীটদের খাওয়ান হয়।

জীবন ইতিহাস—প্রকৃতির মধ্যে স্ত্রী-মথ মালবেরি পাতার উপর ডিম পাড়ে। কিন্তু যখন ইহাদের চাষ করা হয়, ফিলটার কাগজে ইহাদের ডিম পাড়িতে দেওয়া হয়। ডিমগুলির চলিত নাম বীজ। ইহারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকে। কিছুক্ষণ পর একটি ছোট হলুদ রংএর লার্ভা ডিম হইতে বাহির হয়। ধারালো চোয়ালের দ্বারা শূক অতিশয় আগ্রহভরে মালবেরি পাতা খায়। ইহা দ্রুত চারবার খোলস ছাড়ে। চতুর্থবার খোলস ছাড়িবার পর একজোড়া সিল্কগ্রন্থি দেহের পাশে দেখা যায়। এইবার শূকটি খাদ্যগ্রহণ করে না ও একটি কোকুন দিয়া দেহ আটকাইয়া রাখে। তাহার সিল্কগ্রন্থি হইতে সিল্ক নির্গত হইতে থাকে এবং

শূকটি তাহার মুখ দিয়া সিল্ক বা রেশম জড়াইতে থাকে। প্রথমে ইহা চটচটে থাকে কিন্তু বাতাসের সংস্পর্শে শক্ত হইয়া যায়। সুতরাং শূকের দেহটি কোকুন নামে একটি রেশমের পেটিকায় ঢাকা থাকে, এখন ইহার নাম পিউপা। কোকুনের ভিতর পিউপা দ্রুত পরিবর্তিত হয়। প্রথমে ক্রিস্যালিস্ ও সর্বশেষে পূর্ণাঙ্গ মথে পরিণত হয়। পূর্ণপরিণত মথ কোকুনের একটি দিক নরম করিয়া তাহার ভিতর হইতে বাহির হয়। রেশমশিল্পে সমস্ত সিল্ক যাহাতে পাওয়া যায় সেইজন্য কোকুনটিকে গরম জলে রাখা হয়, শূকটিকে মারিয়া ফেলিবার জন্য। কোকুন হইতে মৃত পতঙ্গটি বাহির করিয়া দেওয়া হয় ও গরম জলে ভিজানো হয় যাহাতে রেশমে ও কোকুনের ভিতরে লাগানো আঠা ধুইয়া যায়। গাছের সরু ডালের বুরুশ প্রস্তুত করিয়া কোকুনগুলি জলে আস্তে আস্তে নাড়া হয় যাহাতে সূতার আগাটি ভাসিয়া ওঠে—তখন রেশম গোটান হয়। রেশম প্রস্তুত করিবার জন্য রেশমের তন্তুগুলি পাকান হয়। এক একটি পিউপা হইতে এক হাজার গজেরও বেশি রেশম পাওয়া যায়।

ভারতে উৎপন্ন সিল্কের $\frac{2}{3}$ অংশ মহীশূর হইতে আসে। অন্য প্রকার রেশম যথা, মালবেরি রেশম পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও বীরভূমে উৎপন্ন হয়। ইহা দেরাদুন, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে উৎপন্ন হয়। ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশে তসর প্রস্তুত হয়। আসামে উৎপন্ন হয় এণ্ডি। এই রেশম প্রস্তুত করে সেই সকল কীট যাহারা রেড়ির পাতা খায়। এণ্ডি ও মুগা শিল্প আসামের বাণিজ্যের অনেকটা অংশ জুড়িয়া আছে। এণ্ডি কোকুন হইতে রেশম গোটানো যায় না,কিন্তু তাহাকে পেঁজান হয় ও রেশমী পরে কাটা হয়।

রেশম কীটের চাষকে বলা হয় সেরিকালচার।

পূর্ণ হজম না হইলেও মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে (ইংরাজিতে এইরূপ খাদ্যকে Roughage বলা হয়) ও সেইজন্য কোষ্ঠকাঠিন্য হইতে দেয় না। সুতরাং খাদ্য বিজ্ঞানীর মতে সেলুলোজ যে সকল আনাজ তরিতরকারিতে যথেষ্ট আছে সেই সব খাদ্যের বিশেষ উপকারিতা আছে।

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের বেশীর ভাগই **শ্বেতসার**। শ্বেতসার থাকে চাউল, ডাল, গম, বার্লি, ভুট্টা, গোলআলু, শাঁখআলু, কচু প্রভৃতিতে।

চাউল—কিছু শ্বেতসার জাতীয় বিশেষ খাদ্যের বিষয়ে এখানে বর্ণনা করা হইবে। বাঙ্গালী, উড়িয়া, আসামী, মাদ্রাজী ও অনেক এসিয়ার লোক, প্রধানত ভাত খাইয়া জীবন যাপন করে। চাউলেই শস্যাদির মধ্যে কম প্রোটিন থাকে—ইহাতে স্নেহজাতীয় পদার্থ ও লবণ কম থাকে। সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরে ভাতের ফেন ফেলিয়া দেওয়া হয়, এইরূপ করা উচিত নয়। ভাতের ফেনে কতকগুলি মূল্যবান পদার্থ, যথা, চাউলের প্রোটিন, লবণ ও খাদ্যপ্রাণ অনেকটা নষ্ট হয়। শক্তি-উৎপাদক হিসাবে চাউল মূল্যবান খাদ্য।

গম—পৃথিবীর অনেক স্থানে ও পাঞ্জাব, বিহার, উত্তর প্রদেশে গমের অধিক ব্যবহার হয়। গমের প্রস্তুত রুটির সহিত প্রচুর ডাল খাইবার জন্য, যাহারা ভাত খায় তাহাদের অপেক্ষা গমভোজীরা অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী। চাউলের চাইতে গমে প্রোটিনের আধিক্য দেখা যায়।

ডাল— ডালে যথেষ্ট পরিমাণ শ্বেতসার, প্রোটিন, লবণ ও ভাইটামিন থাকায় ডাল অত্যন্ত মূল্যবান খাদ্য। যাহারা মাছ-মাংস খায় না তাহাদের ডাল খাওয়া বিশেষভাবে কর্তব্য।

আলু—আলুতে শ্বেতসার প্রায় $\frac{1}{5}$ অংশ থাকে। ইহা অত্যন্ত মূল্যবান খাদ্য।

ডেক্সিট্রিন—এই পদার্থটি শ্বেতসারের **কতকগুলি** রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে উৎপত্তি হয়। অঙ্কুরিত গম বা ধানে প্রচুর পরিমাণে

ইহা থাকে। ডায়াস্টেজ নামে একটি কিণ্ব কিছুক্ষণ শ্বেতসারের সহিত মিশাইয়া রাখিলে ডেক্সিট্রিন প্রস্তুত হয়। ডেক্সিট্রিন শ্বেতসার অপেক্ষা সহজে জীর্ণ হয়। পাঁউরুটি, বিস্কুট, লুচি প্রভৃতি খাদ্যে অনেকটা ডেক্সিট্রিন থাকে। ডেক্সিট্রিনভূত খাদ্যের উদাহরণ আমাদের অতি পরিচিত—মুড়ি, খই ও ভাজা চিঁড়া।

দ্বি-শর্করা—যথা ইক্ষু শর্করা, দুগ্ধ শর্করা ও মল্ট শর্করা; ইহারা দানাদার পদার্থ ও সহজে জলে দ্রবণীয়। এই পদার্থগুলি আমাদের খাদ্যে মূল্যবান উপাদান ও পরিপাক হইলে ইহারা আরও সরল এক শর্করায় পরিণত হয়।

ইক্ষু শর্করা—কোনও কোনও ফলে ও উদ্ভিদের রসে প্রচুর পরিমাণে এই শর্করাটি থাকে। যথা—আখ, বীটপালং, খেজুরের রস, তালের রস, আনারস ও গাজরে ইহার আধিক্য দেখা যায়।

দুগ্ধ শর্করা—সকল স্তন্যপায়ীর দুধে ল্যাকটোজ থাকে। মানুষের দুগ্ধে শতকরা ৬-৭ ভাগ এবং গরু ও ছাগলের দুধে শতকরা ৪·৫—৫ ভাগ দুগ্ধ শর্করা থাকে। ইক্ষু শর্করার চেয়েও ল্যাকটোজ অন্ত্রে সহজেই পরিপাক হওয়ায় শিশুর খাদ্য হিসাবে ইহা অত্যন্ত মূল্যবান।

মল্ট শর্করা (মলটোজ)—পূর্বেই বলা হইয়াছে লালারসে যে কিণ্ব থাকে তাহা শ্বেতসারকে জীর্ণ করিয়া এই সরল পদার্থে পরিণত করে।

একশর্করার মধ্যে প্রধান দ্রব্যটি দ্রাক্ষাশর্করা বা গ্লুকোজ। পাকা ফলে, উদ্ভিদের রসে অন্য শর্করার সহিত গ্লুকোজ থাকে। আঙ্গুরের রসে প্রচুর গ্লুকোজ থাকে। শ্বেতসার জীর্ণ হইয়া আমাদের দেহে গ্লুকোজে পরিণত হয়। **ফল শর্করা বা ফ্রাকটোজ**—মধু, পাকা ফল, উদ্ভিদের রসে এই শর্করা পাওয়া যায়। মধুর উপাদানের প্রায় অর্ধেকটা এই শর্করা। **গ্যালাকটোজ**—প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় এই শর্করা পাওয়া যায় না। কিণ্বের সাহায্যে দুগ্ধ শর্করা (ল্যাকটোজ) হইতে এই শর্করাটি উৎপন্ন হয়।

আমিষজাতীয় পদার্থ বা প্রোটিন : উদাহরণ—মাংস, মাছ, ডিম, লিভার, দুধ, ডাল, সয়াবিন প্রভৃতি। প্রোটিনে কার্বন, হাইড্রোজেন, গন্ধক প্রভৃতি রাসায়নিক মূল পদার্থগুলি থাকে। উপরন্তু সকল প্রোটিনে নাইট্রোজেন থাকে। ইহার জন্য প্রোটিনকে বলা হয় নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ। হজমের পর প্রোটিন কতকগুলি নাইট্রোজেনযুক্ত সরল পদার্থে পরিণত হয়। ইহাদের নাম অ্যামাইনো এ্যাসিড। কোন অট্টালিকা নির্মাণের পূর্বে যে লোহার কাঠামো প্রস্তুত করা হয় সেই কাঠামোকে যদি প্রোটিনের অণু বলিয়া ভাবা যায় তবে কাঠামোটির পৃথক লৌহদণ্ডগুলিকে এক একটি অ্যামাইনো এ্যাসিড বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। অনেকেই আবার একটি ইমারতের ইটগুলির সহিত অ্যামাইনো এ্যাসিডের তুলনা করিয়াছেন। প্রোটিনের গুণ : (ক) দেহে যে ভাঙ্গন চলিতেছে তাহা পূরণ করে (খ) দেহের বৃদ্ধি করে (শিশুদের বেলায় ইহা বেশী দেখা যায়) (গ) কর্মক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি করে (ঘ) তাপের সৃষ্টি করে। প্রোটিনের অ্যামাইনো এ্যাসিডের মধ্যে কতকগুলি অন্যগুলি অপেক্ষা অধিক আবশ্যকীয়। এইজন্য পুষ্টির জন্য নানা প্রোটিনের মূল্যের প্রভেদ আছে। আমিষজাত প্রোটিন, যথা, মাংস, ডিম, মাছ, দুধ প্রভৃতিতে আবশ্যকীয় অ্যামাইনো এ্যাসিড অধিক থাকায় তাহাদের খাদ্যমূল্যও অধিক। এইজন্য নিরামিষাশীদের সম্ভব হইলে প্রচুর পরিমাণে দুধ বা দুগ্ধজাত খাদ্য খাওয়া উচিত। এইখানে প্রধান দুইটি প্রোটিন খাদ্যের কিছু বিবরণ দেওয়া হইল।

দুধ—দুধ একটি সম্পূর্ণ খাদ্য, তাই সকল খাদ্যের মধ্যে দুধের স্থান সর্বোচ্চে। পুষ্টির জন্য যাহা দরকার তাহার প্রায় সবই দুধে থাকে, তাই শিশুর জীবনধারণের জন্য প্রকৃতি মাতৃস্তন্যে দুধের ব্যবস্থা করিয়াছে।

মাংস—সমস্ত পৃথিবীর লোকে প্রোটিনের জন্য মাংস খায়। এই প্রোটিন সহজেই পরিপাক হয় বলিয়া খাদ্য হিসাবে ইহা অতুলনীয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাংস অধিক পরিমাণে না খাওয়াই ভাল।

মাছ—মাংসের পরেই মাছের স্থান। ইহা মাংসের চেয়েও সহজ-পাচ্য। বাঙালীদের নিকট মাছ একটি লোভনীয় প্রোটিন প্রদায়ক খাদ্য। মাছে প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ প্রোটিন থাকে।

ডিম—স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য হিসাবে ডিমকে দুধের পরেই ধরা যায়। প্রোটিন, স্নেহজাতীয় পদার্থ ও ভাইটামিন প্রভৃতিতে ডিম ভরা থাকে।

স্নেহজাতীয় পদার্থ—উদাহরণ ঃ ঘি, তেল, মাখন, চর্বি প্রভৃতি। স্নেহজাতীয় পদার্থে অঙ্গার, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন থাকে, তবে শেষোক্ত দুইটি পদার্থের অনুপাত কার্বোহাইড্রেটের মত নয়। স্নেহজাতীয় পদার্থ আমাদের দেহে তাপের সৃষ্টি করে ও কর্মের জন্য প্রচুর শক্তি দেয়।

দুইটি অতিপরিচিত স্নেহজাতীয় পদার্থের বিষয় এখানে বলা হইল ঃ

(১) **ঘি**—ভারতীয়রা দৈনন্দিন ব্যবহার করেন। অন্য ফ্যাটের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা শীঘ্র হজম হয়। ঘি হইতে প্রচুর শক্তি পাওয়া যায়।

(২) **উদ্ভিজ্জ তেল**—বাঙালীদের অন্যতম প্রধান খাদ্য সরিষার তেল। ভারতের অন্য স্থানে তিল ও নারিকেল তেল খাওয়া হয়। দেহে শক্তি ও উত্তাপ সৃষ্টির জন্য তেল অপরিহার্য। অন্য খাদ্যকে ইহা সুস্বাদুও করে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ধ্বংসসাধক প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ এবং ভেষজ উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(ক) ভেষজ উদ্ভিদ

বহু প্রাচীন কাল হইতে মানব সমাজ নানা প্রকার রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহাদের মূল্য অপরিসীম। পৃথিবীতে কয়েক হাজার উদ্ভিদ, বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ভারতে এইরূপ উদ্ভিদের প্রায় চারি হাজার প্রজাতি পাওয়া যায়। গ্রামের ওঝারা এবং জঙ্গলের অধিবাসীরা এইরূপ অনেক উদ্ভিদের সহিত পরিচিত। তাহারা এই সকল উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফল ও বীজ অশোধিত অবস্থায় ব্যবহার করে। বর্তমানে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্যাস বাহির করিয়া বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের বেশীর ভাগ উদ্ভিদ বন-জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে কোন কোন ভেষজ উদ্ভিদ চাষ করা হইতেছে। ইহাদের কোষে নানা রকম রাসায়নিক বস্তু রহিয়াছে, যাহাদের মধ্যে এ্যালকালয়েড অন্যতম। এইজন্য ইহারা খুবই বিষাক্ত।

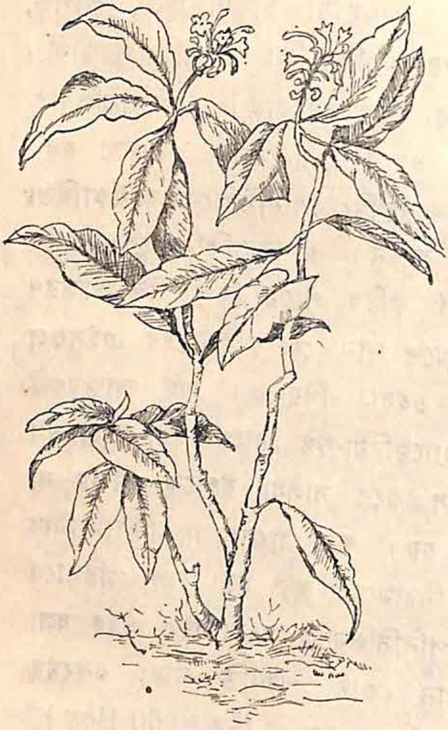
পেনিসিলিয়াম—ইহা ছত্রাক শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের বর্ণ সবুজ নহে। দেহটি ছোট ছোট সূতার ন্যায় বস্তু দ্বারা গঠিত। ইহাদের বর্ণ নীল অথবা সবুজ হয়। ইহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার বায়বীয় শাখাগুলি ঝাঁটার মত অংশ বহন করে। তাহাকে পেনিসিলাস বলা হয়। পেনিসিলাস কথা হইতে পেনিসিলিয়াম নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাদের অনেকগুলি প্রজাতি আছে।

অধিকাংশ প্রজাতি মৃতজীবী। ইহারা সাধারণতঃ পচা তরিতরকারী, ফল, মাংস ইত্যাদিতে জন্মায়। ইহা ছাড়াও চামড়া, জুতা, কাপড়, কাগজ, বই ইত্যাদিতে পাওয়া। কিছু কিছু প্রজাতি পরজীবী। তোমরা পেনিসিলিন ঔষধের নাম শুনিয়াছ। পেনিসিলিয়াম নোটেটাম নামক প্রজাতি হইতে পেনিসিলিন প্রস্তুত হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিনের কার্যকারিতা তাঁহার গবেষণাগারে আবিষ্কার করেন। একদিন তিনি গবেষণাগারে দেখিতে পান যে, ব্যাক্টেরিয়া কৃষ্টির পাত্রে বিন্দু বিন্দু আস্তরণ পড়িয়াছে। পরে তিনি দেখিতে পান যে, কৃষ্টিপাত্রের এইসকল স্থানে ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই আস্তরণটি পেনিসিলিয়াম নোটেটাম। ব্যাক্টেরিয়া-সৃষ্ট রোগের ইহা মহৌষধ। পেনিসিলিন ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করে বলিয়া ইহাকে বীজঘ্ন বা এ্যান্টিবাইওটিক ঔষধ বলা হয়। জ্বর, ঠাণ্ডালাগা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি বহু রকমের রোগ নিরাময়ের জন্য ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। তাই পেনিসিলিনকে সর্বরোগহর ঔষধ বলা হয়। পেনিসিলিয়ামের কোন কোন প্রজাতি নানা রকমের সুগন্ধযুক্ত পনীর তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়। (চিত্র পৃঃ 60 Bতে)

সর্পগন্ধা—ইহা গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ও দ্বি-বীজপত্রী। পাতাগুলি কাণ্ডে আবর্ত আকারে সজ্জিত থাকে। ফুল সাধারণতঃ শ্বেত বর্ণের হয়, কোন কোন পাতায় বেগুনী বর্ণের আভা থাকে। ইহার মূলের শাখা-প্রশাখাগুলি সর্পের ন্যায়। এই উদ্ভিদ পশ্চিমঘাট ও পূর্ব-ঘাট পর্বতমালা, হিমালয়ের পর্বত অঞ্চলে, আসাম, উড়িষ্যা এবং বিহারে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও শ্রীলঙ্কা, বর্মা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, জাভা ও মালয়ে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে ভেষজ ঔষধ হিসাবে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। লৌকিক উপাখ্যানে ইহার

সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। যেমন, বেজি, গোখরো সাপের সহিত লড়াই করিবার পূর্বে শক্তি আহরণের উদ্দেশ্যে ইহার পাতা ভক্ষণ করিত। পাশ্চাত্য জগতে ইহার ব্যবহার বা পরিচিতি সেরূপ ছিল না। ইহা সর্বরোগ-হর ঔষধ। ইহার পাতা বা পাতার রস এবং প্রধানতঃ মূল ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ভারতবর্ষে নানা রোগে যেমন, মৃগী, অনিদ্রা, মস্তিষ্ক বিকৃতি, পেটের বিভিন্ন রোগ, কলেরা, মাথাধরা, অন্ধত্ব, নানা ধরনের জ্বর, ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হইত। সাপের বা পোকামাকড়ের কামড়ে ইহা বিষঘ্ন ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। সাম্প্রতিককালে আরো বিভিন্ন রোগে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে, যেমন, রক্তের উচ্চচাপে। ইহার মূল শুকাইয়া গুঁড়া করা হয় এবং পরে ইহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। ইহার স্বাদ তিক্ত। প্রাচীন কালের এই ঔষধটি বর্তমানে অতি প্রয়োজনীয় ঔষধরূপে পরিগণিত হইয়াছে।



সর্পগন্ধা

ধুতুরা—ইহা দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের অন্তর্গত। ইহা গুল্মজাতীয় এবং প্রায় চারি ফিট পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতা ডিম্বাকার এবং বৃন্তটি লম্বা। ইহার দলমণ্ডল ফানেল আকারের। ফুল সাধারণতঃ শ্বেত

বর্ণের হয়। বেগুনী বর্ণের ফুলও দেখা যায়। ফল ক্যাপস্যুল জাতীয় এবং বীজগুলি বৃক্কাকার।

সমগ্র পৃথিবীতে, বিশেষ করিয়া এশিয়ায় ধুতুরা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বনে-জঙ্গলে এই উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে হয়। ইহার অনেকগুলি প্রজাতি আছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহার চাষ করা হয়। ভারতে প্রায় ৩০টি প্রজাতি পাওয়া যায়।

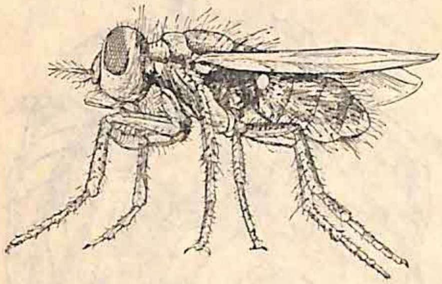


ধুতুরা

ইহা খুবই বিষাক্ত উদ্ভিদ। বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য সাধারণতঃ ইহার পাতা এবং বীজ ব্যবহৃত হয়। তবে ফুল এবং ফলও ব্যবহৃত হয়। পাতা পোড়াইয়া তাহার ধোয়া হাঁপানী রোগীদের কিছু আরামদায়ক। শরীরের কোন অংশ পুড়িয়া গেলে ইহার পাতা ব্যবহার করা হয়। ইহা বেদনানাশক ও নিদ্রাকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ফুলের রসে কানের ব্যাথার উপশম হয়। অকালে চুলপড়া রোধ করিবার জন্য মাথায় এই ফলের রস ব্যবহার করা হয়। চোখের তারারন্ধ্র বৃদ্ধি করিবার জন্য ইহার ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ খাইলে মৃত্যু ঘটিতে পারে।

(খ) ধ্বংসসাধক প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ

আমাদের গৃহের মাছির জীবন ইতিহাস ঃ যে কোন ভিজা ও সামান্য গরমে পচনশীল বস্তু বা ময়লায় মাছি ডিম পাড়ে। মাছির লার্ভা দীর্ঘ হয়; ইহা আলো সহ্য করিতে পারে না এবং ইহার খাদ্য যদি শুকাইয়া যায়, ভিজ স্থানগুলির দিকে সরিয়া যায়। লার্ভা ৫ দিনের মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। ইহার পর একটি ঘোর বাদামী রং-এর পিউপায় পরিণত হয়। মাছির উৎপত্তির ১৪ দিনের মধ্যে একটি নূতন বংশ ডিম পাড়িতে সুরু করে।



মাছি

মাছির নানা অভ্যাস ঃ—সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নোংরা অভ্যাস হইতেছে যে, নর্দমার ময়লায় বসিয়া লক্ষ লক্ষ রোগের জীবাণু তাহার লোমশ পায়ে (চিত্র দেখ) মাখিয়া কিছুক্ষণ পরেই আমাদের খাদ্যপূর্ণ বাসনের উপর আসিয়া বসে—দুধের বাটিতে মুখ লাগাইয়া দুধ পান করিবার পর উড়িয়া চিনির পাত্রে বসে ও দূষিত ময়লা লালা বাহির করিয়া চিনি দ্রবীভূত করে, দ্রবণটি পান করিবার পূর্বে রোমশ ত্বকে ঢাকা দেহ ও লালা নানা রোগের জীবাণু বহন করে। যথা, টাইফয়েড, কলেরা, যক্ষ্মা, অ্যামিবিক, রক্ত আমাশয়ের সিস্ট, নানা পরজীবীর ডিম প্রভৃতিও বহন করে।

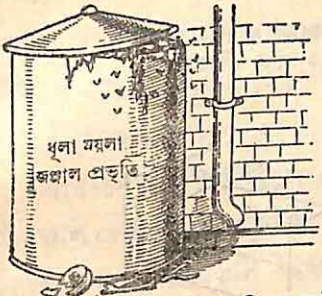


মাছির রোমশ পা

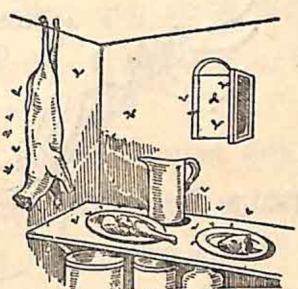
এইভাবে আমাদের খাদ্যে সংক্রামিত হয়। তাই জলবাহিত ও দুগ্ধবাহিত নানাপ্রকার বিপজ্জনক রোগের জন্য মাছি দায়ী।

মাছি প্রতিরোধের নানা উপায়—মাছির নানা অভ্যাস যথা, ঠাণ্ডায় নিস্তেজ হয়, দিনের আলো পছন্দ করে ও ৫০০-১০০০ গজের

মাছি কিভাবে রোগ প্রসার করে



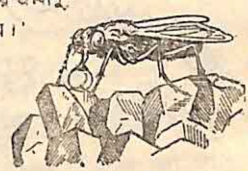
ধূলা ময়লা ও জঞ্জালের উপর মাছি বসে তাই তাহার শরীরে নানাপ্রকার রোগের জীবাণু লাগিয়া যায়।



কাটা মাংসকে মাছি সংক্রমিত করিতেছে



দুধ বা অন্য পানীয়ের উপর ঐ মাছি বসিয়া জীবাণুর দ্বারা সংক্রমিত করে।

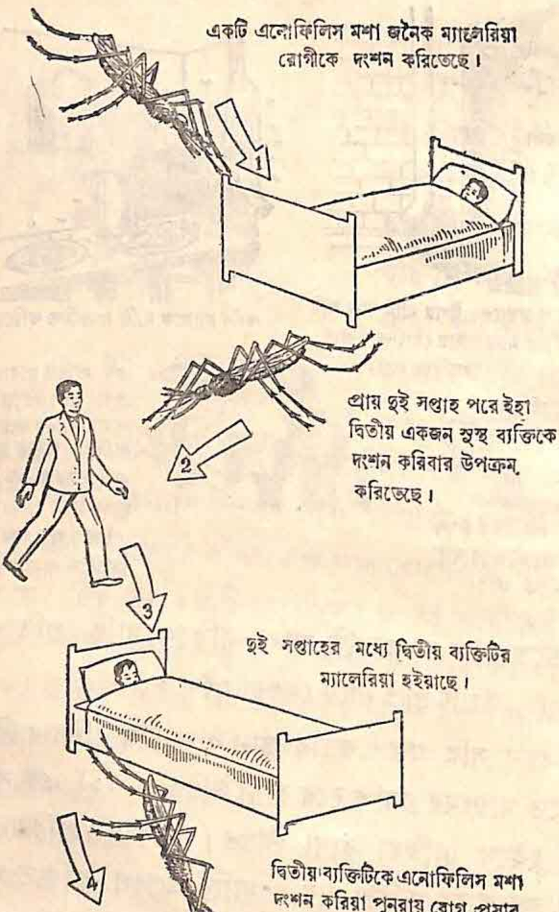


এই মাছিটি তাহার পাকস্থলীর প্রথম অংশ হইতে এক ফোঁটা লালা বাহির করে। এই লালায় খানিকটা মিছরি দ্রবীভূত হয়। মাছি পুনরায় এই ফোঁটাটি মুখের মধ্যে টানিয়া লয়। এইরূপে লক্ষ লক্ষ জীবাণু মিছরিকে সংক্রমিত করে।

বেশী উড়িতে পারে না প্রভৃতি জানা থাকিলে মাছি প্রতিরোধ করা সহজ হয়। উপায়গুলি নীচে দেওয়া হইল:

(১) ড্রেন, সার প্রস্তুত করার স্থান বা মাছির বসিবার প্রিয় স্থানগুলি হইতে মানুষের বসতি দূরে রাখা উচিত। (২) এই সকল স্থান সম্ভবপর হইলে ঢাকিয়া রাখা উচিত। কারণ ঢাকিয়া রাখিলে স্থানগুলি অন্ধকারে ভরিয়া যায় ও মাছি প্রবেশ করিতে পারে না। (৩) আমাদের খাদ্যদ্রব্য জালের ভিতর বা জালের আলমারির মধ্যে রাখা উচিত। (৪) বাড়ি-ঘর পরিষ্কার রাখা উচিত এবং কোন জিনিস পচিতে দেওয়া উচিত নয়। ময়লা, ডাস্টবিনে ফেলা উচিত, মাটিতে পুঁতিয়া রাখা উচিত বা পোড়াইয়া ফেলা উচিত। (৫) রান্নাঘরের বাসন-কোসন মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া ঢাকিয়া রাখা উচিত।

মশা—মশাও একটি ক্ষতিকর পতঙ্গ। মশার পুষ্টিগ্রহণে বিশেষত্ব আছে। পৌষ্টিকতন্ত্রে থাকে (১) মুখ ও মুখাঙ্গ (২) গলবিল (৩) খাদ্যনালী—একটি কপাটিকা খাদ্যনালী হইতে



পাকস্থলীতে রক্ত প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করে (৪) পাকস্থলী (৫) অন্ত্র। বক্ষে লালাগ্রন্থি থাকে। পুরুষ মশার মুখাঙ্গ পরিবর্তিত হয় চুষিবার জন্য, স্ত্রীমশার দংশন ও চুষিবার জন্য। গলবিল তরল পদার্থকে চুষিয়া ভিতরে নামাইয়া দেয়। লালাগ্রন্থির

রসে রক্ততঞ্চন বন্ধ হয়—রক্ত তরল থাকিলে ইহা পাকস্থলীতে গ্রহণ করিতে সুবিধা হয়। খাদ্য গ্রহণের সময় করাতের মত প্রথম ম্যাক্সিলা চামড়া ভেদ করে, কতকগুলি মুখাঙ্গ সাময়িক পরিবর্তিত হইয়া একটি লম্বা নল প্রস্তুত করে, যাহার দ্বারা গলবিল তরল রক্ত টানিয়া নেয়। স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা রক্তের সহিত রোগীর দেহ হইতে ম্যালেরিয়া পরজীবী গ্রহণ করে।

সাধারণ মশা (কিউলেক্স)—ইহারা ডিম জলের উপর পাড়ে; ডিমগুলি ভেলার মত সাজানো থাকে, ম্যালেরিয়াবাহী **এ্যানোফিলিস** স্ত্রীমশা তাহার ডিমগুলি আলাদা করিয়া পাড়ে—সেগুলি বিচিত্র-ভাবে সাজানো থাকে। দুই-তিন দিনের মধ্যে ডিম হইতে ক্ষুদ্র স্বচ্ছ শূক বা লার্ভা বাহির হইয়া চঞ্চল ও সক্রিয় হইয়া ওঠে। খাদ্য গ্রহণ করিতে করিতে উহারা বড় হইয়া ওঠে ও জলের উপরের তল হইতে নিশ্চল হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া জলের মধ্যে ঝুলিয়া থাকে। কিউলেক্স লার্ভা মাথা নিচুর দিকে রাখিয়া জলে কোণাকুণিভাবে ঝোলে। একটি লম্বা শ্বসন নলের দ্বারা এ্যানোফিলিস লার্ভা জলের উপরের তলের সমান্তরাল হইয়া ভাসে। ইহার শ্বসন নলগুলি ছোট হয়। এইভাবে লার্ভাগুলি বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিতে পারে। ১৫ দিনের মধ্যে ইহারা অনেকবার খোলস ছাড়ে।

মশা নিবারণ প্রণালী

(১) মশা জলে জন্মাইয়া কেবলমাত্র কয়েক শত গজ উড়িতে পারে। এইজন্য গৃহস্থের উচিত ছোট ছোট ডোবা ভরাট করা বা সেই সকল স্থান হইতে জল বাহির করিয়া দেওয়া। পুরানো পরিত্যক্ত হাঁড়ি, ভাঙ্গা টিন, কাটা বাঁশ প্রভৃতিতে জল জমিলে তৎ-ক্ষণাৎ সেগুলি খালি করা উচিত বা ধ্বংস করা উচিত। এমন কি গাছের গুঁড়ির ছোট ছোট গহ্বরে বৃষ্টির জল জমিতে পারে ও তাহাতে মশা জন্মায়—গহ্বরগুলি ভরাট করা উচিত। (২) খোলা

প্রস্রাবাগারগুলি বদলাইয়া স্যানিটারি পায়খানা বা সেপটিক ট্যাঙ্ক করা উচিত। (৩) যে স্থানে অনেকটা জল জমিয়া থাকে কিছু সস্তা তেল তাহার উপর ছড়াইয়া দিলে লার্ভাগুলি উপরের বাতাস হইতে অক্সিজেন লইতে না পারিয়া মরিয়া যাইবে। (৪) লার্ভা-ভক্ষণকারী কতকগুলি ছোট ছোট মাছ যথা, ত্রিচোক, জলে ছাড়িয়া দিলে লার্ভাগুলি ধ্বংস হয়। (৫) রাত্রিবেলা মশারী ব্যবহার করা উচিত। (৬) বাড়ির কাছে লম্বা ঘাস ও ঝোপ ছোট করিয়া কাটা উচিত; কারণ দিনের বেলায় মশা ঝোপের ছায়ায় থাকে; একই কারণে ঘরের দেওয়াল চুনকাম করা উচিত। (৭) কতকগুলি মশা ধ্বংসকারী ঔষধ ব্যবহার করিতে পারা যায়। যথা—ডি.ডি.টি. গ্যামাক্সিন প্রভৃতি।

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা

(ক) অনেক বৎসর ধরিয়া ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা হইত কুইনিন প্রয়োগে। (খ) আধুনিককালে মেপাক্রিন, ডারাপ্রিম, প্যালিউড্রিন, ক্লোরোকুইন প্রভৃতি ঔষধে বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে। অন্যান্য মশকবাহী রোগ—(১) গোদ, (২) ডেঙ্গু, (৩) পীতজ্বর প্রভৃতি।

ইঁদুর—সমস্ত পৃথিবীতেই এই জীবটি পাওয়া যায়। তবে বিশেষতঃ ভারতের সকল স্থানেই ইহার বাসভূমি। গৃহ ইঁদুর সব খাদ্যই



খায়; তবে মাংস জাতীয় খাদ্যে তাহার বিশেষ একটা রুচি নাই। বছরে অনেকবার ইঁদুর শাবকের জন্ম দেয় এবং এক সঙ্গে ৯টি শাবক জন্মায়। প্রাণীর মধ্যে ইহা মানুষের অপরিসীম ক্ষতি করিতে পারে।

ইঁদুর ধ্বংস করা ব্যর্থ হইয়াছে। যতই তাহাদের মারিয়া ফেলা যাক না কেন বংশ বৃদ্ধির দ্বারা তাহাদের সংখ্যা পূর্বের ন্যায় অধিক হইয়া যায়। ইঁদুর প্রচুর খাদ্যশস্য নষ্ট করে; তাহার চেয়েও বেশী ব্যবহারের অনুপযোগী করে। ইঁদুর গৃহপালিত পায়রা, মুরগী এমন কি শূকরের শত্রু। মানুষের গৃহের মেঝে, দেওয়াল প্রভৃতির অনেক ক্ষতি করে। বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় ইঁদুর ধ্বংস করার জন্য।

ইঁদুরের দ্বারা রোগ প্রসারণ

(১) **প্লেগ**—ইঁদুরের রক্তে ভীষণ ক্ষতিকারক প্লেগের জীবাণু থাকিতে পারে। ইঁদুর যখন মারা যায় তখন এই জীবাণুর প্রসার হয়, ফ্লি বা র‍্যাটফ্লি দ্বারা। র‍্যাটফ্লি, মরা ইঁদুরের দেহ হইতে অন্য ইঁদুরের দেহের সহিত সংযুক্ত হইয়া হঠাৎ মানুষের দেহে আশ্রয় নেয়। (২) ট্রিকিনা ক্রিমি ইঁদুরের দেহে থাকে এবং মানুষেরও ট্রিকিনিয়াসিস্ রোগের কারণ; মাংসপেশীতে এই রোগ হয়। (৩) অন্য একটি ভয়াবহ ব্যাধি, ফিতা ক্রিমি; এই কৃমি ইঁদুরের দেহে প্রথমে অবস্থান করে ও সেই স্থান হইতে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। (৪) একপ্রকার ন্যাবা রোগও ইঁদুরের দ্বারা সংক্রামিত হইতে পারে। (৫) ইঁদুরের দংশনের জন্য একপ্রকার জ্বর হয় তাহার নাম র‍্যাটবাইট ফিভার। আমরা সকলে জানি, ইঁদুর অত্যন্ত অপরিষ্কার স্থানে থাকে ও সেই সকল স্থান হইতে আসিয়া মানুষ ও গৃহপালিত প্রাণীর খাদ্য দূষিত করে, তাহার জীবাণু সংক্রামিত হয় বিষ্ঠার দ্বারা। এইরূপে নানা ভয়ঙ্কর ও জটিল ব্যাধি হইতে পারে। যথা—(৬) অ্যামিবিকডিসেন্ট্রি, (৭) কলেরা, (৮) টাইফয়েড প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি।

ইঁদুর ধ্বংসের জন্য নানা অভিযান চালান যাইতে পারে :

(১) কতকগুলি মাংসাশী স্তন্যপায়ী যথা, বিড়াল, পেঁচা প্রভৃতি রাখিলে ইঁদুর ধ্বংস হয়।

(২) খাবার ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখা উচিত।

(৩) গৃহ, আস্তাবল, ভাঁড়ার প্রভৃতি এমনভাবে নির্মাণ করা উচিত, যাহাতে ইঁদুর তাহার ভিতর বাস করিতে না পারে।

(৪) ড্রেনগুলি জালে ঢাকা উচিত।

(৫) জাহাজগুলি ফিউমিগেট করা উচিত (অর্থাৎ কিছুক্ষণের জন্য বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করা)।

(৬) গৃহের কোন অংশ নির্মাণ করিবার সময় কাঠ ব্যবহার না করিয়া সিমেন্ট ব্যবহার করা উচিত।

(৭) খাবার টেবিল হইতে খাদ্যকণা যাহাতে নীচে না পড়িয়া যায় তাহা দেখা উচিত।

(৮) ময়লা ও জঞ্জাল যেখানে-সেখানে ফেলা উচিত নয়।

(৯) ইঁদুর ধ্বংস হয় অন্য কতকগুলি প্রণালীর দ্বারা। যথা—

(ক) জলের স্রোতে

(খ) ইঁদুরের গর্ত বন্ধ করিয়া

(গ) ইঁদুরের কলের দ্বারা

(ঘ) বিষাক্ত খাদ্য রাখিয়া দিয়া (হলদে ফসফরাস্, বেরিয়াম, কারবনেট, সেঁকো বিষ বা আর্সেনিক)

(ঙ) পূর্বেই বলা হইয়াছে ইঁদুরের গর্তে বিষাক্ত গ্যাস চালাইয়া দেওয়া।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রকৃত প্রাণী ও উদ্ভিদ অথবা চার্ট ও মডেলের সাহায্যে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের বিষয়-বস্তুর প্রদর্শন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরীক্ষা

তোমরা প্রথম পরিচ্ছেদে উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা করিয়াছ। পুস্তকে লেখা কয়েকটি লক্ষণের দ্বারা প্রাণী বা উদ্ভিদের পূর্ণ পরিচয় হয় না। প্রকৃত প্রাণী বা উদ্ভিদ অথবা মডেল ও চার্টের সাহায্যে কিছু কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রদর্শন বর্ণিত হইল।

প্রাণী—

(১) **হাইড্রা**—একটি ওয়াচ গ্লাসে জলের মধ্যে একটি হাইড্রা রাখিয়া হ্যাণ্ড লেন্সের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ কর। ইহা অত্যন্ত ছোট। দেহটি সরু, নলের মত মুখ দেহের একটি মাত্র ছিদ্র। মুখকে ঘিরিয়া অনেকগুলি সরু সরু কর্ষিকা আছে।

(২) **ফিতাকৃমি**—চার্টের সাহায্যে বা জারে সংরক্ষিত প্রাণীটিকে পর্যবেক্ষণ কর। ইহা লম্বায় প্রায় ৭।৮ ফিট। ইহা চ্যাপটা ফিতার ন্যায়। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার দেহটি অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত।

(৩) **কেঁচো**—ভিজা মাটি হইতে একটি কেঁচো সংগ্রহ করিয়া ভালভাবে লক্ষ্য কর। ইহা লম্বা ও সরু নলের ন্যায়। দেহটি কতকগুলি আংটির মত দেহখণ্ড দ্বারা গঠিত।

(৪) **চিংড়ি**—বাজার হইতে একটি চিংড়ি সংগ্রহ করিয়া নিরীক্ষণ কর। দেহের দুইটি অংশ—শিরোচক্র ও উদর। উদরে ছয়টি দেহখণ্ড দেখিতে পাইবে। ইহার দেহ খোলস দ্বারা আবৃত। দুইটি পুঞ্জাক্ষি দেখ। উপাঙ্গগুলি গুনিয়া দেখ। ১৯ জোড়া উপাঙ্গ রহিয়াছে।

(৫) **পাইলা**—পুকুর হইতে একটি পাইলা সংগ্রহ কর। ইহাদের খোলকটি কুণ্ডলী আকারে পাকানো। ইহার মুখে একটি ঢাকনা থাকে। মৃত অবস্থায় ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়। এই অবস্থায় লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার ক্ষুদ্র মস্তকে দুই জোড়া কর্ষিকা ও এক জোড়া সন্ধি থাকে। চলিবার সময় পেশীপদ দেখিতে পাইবে।

(৬) **তারামাছ**—চার্টে বা জারে সংরক্ষিত প্রাণীটির মডেলের সাহায্যে ইহাকে পরীক্ষা কর। ইহা তারকার ন্যায়। দেহটির কেন্দ্র হইতে পাঁচটি বাহুর ন্যায় অঙ্গ বাহির হইয়াছে। দেহত্বক ছোট ছোট কাঁটার দ্বারা আবৃত। প্রতিটি বাহুর মাঝখানে নালিকাপদ রহিয়াছে।

(৭) **আম্ফিয়কৃসাস্**—চার্টে বা জারে সংরক্ষিত প্রাণীর সাহায্যে ইহাকে নিরীক্ষণ কর। দেহটি লম্বা ও বল্লমের ফলার ন্যায়। দেহের অগ্রভাগ ফণার ন্যায়। উহার কিনারা হইতে অনেকগুলি কর্ষিকা দেখা যায়, যাহাকে সিরি বলা হয়। V-র মত কতগুলি মাংসপেশী দেহের দুই পাশে সাজানো থাকে।

(৮) **হাঙ্গর**—চার্টে বা জারে সংরক্ষিত প্রাণীর সাহায্যে ইহাকে পরীক্ষা কর। সারা দেহ প্লাকয়েড নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশে ঢাকা। মুখ মস্তকের দিকে অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, পাঁচ জোড়া ফুলকাছিদ্র মস্তকের দুই পাশে রহিয়াছে। দেহে জোড় এবং বিজোড় পাখনা আছে।

(৯) **রুইমাছ**—বাজার হইতে টাটকা মাছ লইয়া পরীক্ষা কর। ইহা অনেকটা নৌকাকৃতি। সাইক্লয়েড আঁশ দ্বারা দেহটি আবৃত। মুখটি মস্তকের অগ্রভাগে অবস্থিত। দেহ তিন অংশে বিভক্ত —মস্তক, ধড় ও লেজ। জোড় ও বিজোড় পাখনা আছে। মস্তকের দুই পাশে কানকো রহিয়াছে।

(১০) **কুনোব্যাঙ**—ব্যাঙের চার্ট, মডেল বা একটি জীবন্ত ব্যাঙ

নিরীক্ষণ কর। দেহটি মস্তক ও দেহকাণ্ডের দ্বারা গঠিত। সামনের পাত্বটি পিছনের পা অপেক্ষা ছোট। পিঠে ছোট ছোট গুটিকা আছে। চক্ষুর পিছনে কর্ণপটহ আছে। কর্ণপটহের পিছনে প্যারোটিড গ্রন্থি আছে। মুখ ও অবসারণী ছিদ্র দেখ।

(১১) **টিকটিকি**—চার্টের সাহায্যে পরীক্ষা কর। একটি দেওয়ালের টিকটিকিও দেখিতে পার। দেহের বর্ণ ধূসর। ছোট ছোট আঁশের দ্বারা দেহটি আবৃত। মস্তকটি ত্রিকোণাকার। চোয়ালে দাঁত আছে। পিছনের ও সামনের পা সমান। লম্বা লেজ আছে।

(১২) **পায়রা**—একটি চার্টের সাহায্যে বা মৃত পায়রার সাহায্যে ইহার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা কর। সমগ্র দেহ পালকে আবৃত। ইহার তুইটি পা আছে। পায়ের শল্কগুলি দেখ। মস্তকের সামনে একজোড়া চক্ষু আছে। চোয়ালে দাঁত নাই।

(১৩) **গিনিপিগ**—চার্ট বা মৃত গিনিপিগের সাহায্যে ইহার বিভিন্ন অংশ নিরীক্ষণ কর। সমস্ত দেহ লোমে আবৃত। দেহটি তিন ভাগে বিভক্ত—মস্তক, গ্রীবা ও দেহকাণ্ড। চোয়ালে দাঁত আছে। চোখের অক্ষিপল্লবে অক্ষিপক্ষ্ম আছে। মুখের তুই পাশে লম্বা গোঁফ আছে। ইহার চারিটি পা আছে। উদরের অঙ্কদেশে ছোট ছোট স্তনবৃন্ত আছে।

উদ্ভিদ

(১) **স্পাইরোগাইরা**—কোন পুকুর হইতে গৃহীত বা ল্যাবোরেটারীতে সংরক্ষিত এই উদ্ভিদটি খালি চোখে পর্যবেক্ষণ কর। ইহারা কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা হয়। শাখা-প্রশাখাহীন সরু স্থতার ন্যায় ইহার দেহ। ইহার গাত্র পিচ্ছিল। ইহার বর্ণ সবুজ ও দেহে মূল, কাণ্ড ও পাতা থাকে না বলিয়া ইহারা শৈবাল শ্রেণীর অন্তর্গত।

(২) **মিউকর**—কয়েকদিনের বাসি ভিজা পাউরুটির উপর যে

সাদা আস্তরণ পড়ে তাহা হইতেছে মিউকর। এই আস্তরণটি অসংখ্য সাদা শাখা-প্রশাখাসহ সূতার ন্যায় বস্তু দিয়া গঠিত। ইহা সবুজ বর্ণের নহে। ইহার দেহে মূল, কাণ্ড বা পাতা থাকে না। চার্টের মাধ্যমে দেখিতে পাইবে যে, ঐ সূতার ন্যায় বস্তু হইতে বায়বীয় সূতা বাহির হইয়াছে এবং উহাদের অগ্রভাগ গোলাকার। ইহা ছত্রাক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) **ডিপ্লোকক্কাস**—ইহা খালি চোখে দেখা যায় না। চার্টের সাহায্যে ইহার আকার দেখ। ইহা গোলাকার এবং নিউক্লিয়াস নাই। ইহার বর্ণ সবুজ নহে এবং কাণ্ড, মূল পাতাহীন। ইহা ব্যাক্টেরিয়ার অন্তর্গত।

(৪) **লাইকেন**—উদ্ভিদের প্রধান কাণ্ডে সাধারণতঃ ধূসর সবুজ বর্ণের কঠিন আবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা চ্যাপ্টা পাতার ন্যায়। ইহার খানিকটা অংশ চাঁচিয়া লইয়া একটি হ্যাণ্ড লেন্স বা অণুবীক্ষণের দ্বারা পরীক্ষা কর। কতকগুলি সরু সরু সূতার ন্যায় বর্ণহীন বস্তু পরস্পর জড়াইয়া আছে। এই সকল সূতার মধ্যে কিছু কিছু সবুজ কোষ দেখিতে পাইবে। বর্ণহীন সূতার ন্যায় বস্তু হইতেছে ছত্রাক এবং সবুজ বর্ণের অংশটি হইতেছে শৈবাল। সুতরাং দেখিতে পাইবে যে, লাইকেন শৈবাল দিয়া গঠিত। লাইকেনের অধিকাংশ অংশ ছত্রাক দ্বারা গঠিত।

(৫) **মস**—বর্ষাকালে ভিজা দেওয়ালের উপর যে সবুজ বর্ণের আস্তরণ দেখা যায় তাহার কিছুটা অংশ সংগ্রহ কর। ইহা হইতে একটি মস উদ্ভিদ, ওয়াচ গ্লাসে রাখিয়া লেন্স দ্বারা ভালভাবে পরীক্ষা কর। তোমরা দেখিতে পাইবে যে, খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতলা পাতা মাঝখানের কাণ্ডের মত অংশ হইতে বাহির হইয়াছে। ইহার কোন মূল নাই, তবে মূলের মত ছোট ছোট রোমের ন্যায় রাইজয়েড বাহির হইয়াছে। ইহার বর্ণ সবুজ। ইহা ব্রাইওফাইটা শ্রেণীর অন্তভুক্ত।

(৬) **ফার্ণ**—কোন বাগান হইতে এই উদ্ভিদ সংগ্রহ কর। ইহা কাণ্ড, পাতা ও মূল দ্বারা গঠিত। ইহার কাণ্ড মাটির তলায় থাকে বলিয়া ইহাদের মৃদ্‌গত কাণ্ড বলা হয়। পাতাগুলি যৌগিক এবং দেখিতে খুবই সুন্দর। পাতার তলদেশে ছোট ছোট গুটি দেখিতে পাইবে। খয়েরি বর্ণের রোম দ্বারা কাণ্ডটি আবৃত।

(৭) **পাইন**—চার্টের সাহায্যে এই উদ্ভিদটি নিরীক্ষণ কর। ইহা পিরামিডাকার। পাতাগুলি সূচের ন্যায়। ফুলগুলি গুচ্ছাকারে ও বীজটি নগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে।

(৮) **ধানগাছ**—ক্ষেত হইতে একটি ধানগাছ সংগ্রহ কর। কাণ্ড নরম এবং গাছটি বেশী বড় নহে। গাছটি বীরুৎ জাতীয়। পাতাগুলি লম্বা ও সরু। ফলকে সমান্তরাল শিরা-বিন্যাস দেখ। কাণ্ডের শীর্ষদেশে ফুলগুলি গুচ্ছাকারে আছে। কাণ্ডের গোড়া হইতে গুচ্ছাকারে অস্থানিক মূল রহিয়াছে। পাতার উভয় তলের বর্ণ একই। পত্রমূলটি দেখ বেশ চওড়া। এইবার বীজটি পরীক্ষা কর। ইহা মাত্র একটি বীজপত্র দিয়া গঠিত এবং বীজের অধিকাংশ অংশ শস্য দ্বারা গঠিত। বীজটি পাতলা ত্বকের দ্বারা আবৃত এবং জুড়িয়া গিয়াছে। পাতলা ত্বকটি ফল।

(৯) **সরিষা গাছ**—ক্ষেত হইতে এই গাছটি সংগ্রহ কর। ইহা ছোট এবং কাণ্ডটি নরম বলিয়া বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। পাতার প্রান্তভাগ খাঁজকাটা। পাতার উপরিতলের বর্ণ নিম্নতলের বর্ণ অপেক্ষা গাঢ় সবুজ। পাতার শিরা-বিন্যাস লক্ষ্য কর। দেখিবে, চারিটি স্তবকই রহিয়াছে। ফলটি নীরস সিলিকা শ্রেণীর। বীজটি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহাতে দুইটি বীজপত্র থাকে।

(১০) **জবা পাতা**—একটি জবাগাছের পাতা সংগ্রহ কর। এইবার পাতাটিকে ভালভাবে নিরীক্ষণ কর। পাতাটি ডিম্বাকার। লক্ষ্য করিয়া দেখ, পত্রের অগ্রভাগ সরু কোণের সৃষ্টি করিয়াছে।

এইজন্য ইহাকে সূক্ষ্মাগ্র বলে। পাতার প্রান্তদেশ করাতের মত এবং দাঁতগুলি উপরের দিকে রহিয়াছে বলিয়া ক্রকচ প্রান্ত বলা হয়। পৃষ্ঠদেশ হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ। ইহার পৃষ্ঠদেশ মসৃণ। এইবার পাতাটির শিরা-বিন্যাস লক্ষ্য কর। একটি প্রধান শিরা পাতার মাঝখানে রহিয়াছে। ইহার পার্শ্বদেশ হইতে বহু পার্শ্ব-শিরা তাহার শাখা-প্রশাখাসহ জালিকার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকে পক্ষল শিরা-বিন্যাস বলা হয়। পাতাটির বৃন্ত সরু এবং লম্বা। ইহার গোড়া হইতে দুইটি সরু উপপত্র বাহির হইয়াছে।

(১১) ধুতুরা ফুল– এই ফুলটি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহা চারিটি স্তবক দ্বারা গঠিত। বাহিরের স্তবকটি পাঁচটি সবুজ বর্ণের বৃত্যংশ দিয়া গঠিত। ভাল করিয়া লক্ষ্য কর, দেখিবে নীচের অংশ জুড়িয়া গিয়া নলের আকার ধারণ করিয়াছে। দলমণ্ডল পাঁচটি সাদা বা বেগুনী বর্ণের দল দ্বারা গঠিত। ইহা জুড়িয়া গিয়া কলমের আকার ধারণ করিয়াছে। এইবার ফুলটি কাটিয়া পরীক্ষা কর। পাঁচটি পুংকেশরের সূত্র দলের সহিত জুড়িয়া গিয়াছে। ইহাদের পরাগধানী চ্যাপ্টা। ডিম্বাশয়টি ফুলের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। গর্ভদণ্ডটি লম্বা এবং ইহার অগ্রভাগ লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে, ইহা দুইভাগে বিভক্ত।

(১২) আম—এই ফলটিকে কাটিয়া পরীক্ষা কর। ইহা তিনটি অংশ দ্বারা গঠিত। বাহিরের অংশটি ত্বকের সৃষ্টি করিয়াছে। মাঝখানের অংশটি দেখ বেশ শাঁসালো ও সরস। ভিতরের অংশটি খুবই শক্ত। ইহা ড্রূপ শ্রেণীর ফল।

(১৩) ছোলা বীজ—একটি ছোলা বীজ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরের দিন পরীক্ষা কর। ইহার বাহিরে ত্বকটি খয়েরি বর্ণের। ভিতরের ত্বকটি পাতলা এবং বহির্ত্বকের সহিত জুড়িয়া গিয়াছে। বীজের ছুঁচালো অংশে একটি ক্ষতচিহ্ন দেখিতে পাইবে। ইহা প্রবীজনাভি। ইহার ঠিক পাশে একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্র দেখিতে পাইবে

ইহা ডিম্বকরন্ধ্র। এইবার ত্বকটি ছাড়াও। ভ্রূণটি ভালভাবে পরীক্ষা কর। ইহা দুইটি স্থূল ও হলুদবর্ণের বীজপত্র এবং সরু ভ্রূণমুকুল ও ইহার নিম্নভাগকে ভ্রূণমূল বলা হয়।

প্রাণী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ—স্থানীয় কতকগুলি জায়গায় যাওয়া উচিত, যথা, চিড়িয়াখানা ও যাদুঘর। চিড়িয়াখানায় বিশেষ করিয়া সেইসকল প্রাণীগুলি দেখা উচিত, যাহাদের সাধারণতঃ গ্রামে বা শহরে দেখা যায় না। চিড়িয়াখানার বিভিন্ন পাখী, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর নাম ও তাহাদের বাসস্থান এবং বৈজ্ঞানিক নাম লিখিয়া রাখিবে।

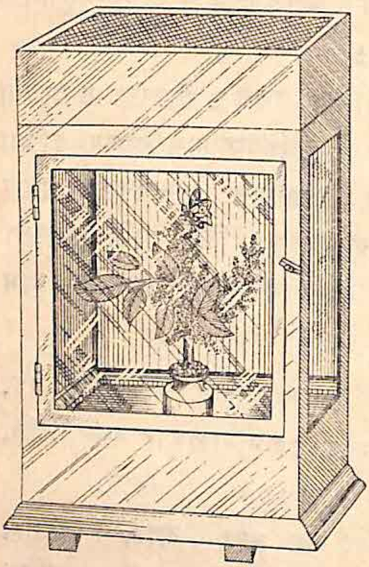
বাড়ির আশেপাশে কেঁচো, জোঁক, বিছা, প্রজাপতি, মথ, ড্রেগনফ্লাই ও অন্য পতঙ্গ, বাজার হইতে নানাপ্রকার মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

সাধারণ প্রাণীসংগ্রহের জন্য (যথা মাছ, ব্যাঙ, গিরগিটি, টিকটিকি প্রভৃতি) একটি বড় চিমটে রাখা উচিত। ৪% ফরমালিন লোশন, কিছু রেক্‌টিফাইড স্পিরিট, ক্লোরাল হাইড্রেট, কাঁচের স্পেসিমেন জার, ড্রাম প্রভৃতি রাখা উচিত।

নানা পতঙ্গ, প্রজাপতি ও মথ ধরিবার উপকরণ। প্রাণীগুলির নাম—প্রজাপতি ; মথ, ড্রেগনফ্লাই, ফড়িং, পিঁপড়া, পঙ্গপাল, ছারপোকা প্রভৃতি। উপকরণগুলি দেখ :—

(১) কাঁচের বাটি, (২) গ্লাসজার ও বড় বোতল, (৩) ঢাকা কাঁচের কেস যাহাতে জীবন্ত কীট-পতঙ্গ দেখা যায়, (ছবি দেখ) প্রজাপতির রূপান্তরও দেখা যায়, (৪) ছোট ছোট বোতল, কীট-পতঙ্গের জীবন ইতিহাস দেখিবার জন্য, (৫) বড় বাক্স, শুকনা পতঙ্গ সংরক্ষণের জন্য, কাঠের বা পিচবোর্ডের চ্যাপ্টা বাক্স চলিবে, (৬) কতকগুলি ঔষধ, অ্যালকোহল, ন্যাপথ্যালিন বল সংরক্ষণের জন্য ক্লোরোফরম, কারবন টেট্রাক্লোরাইড প্রভৃতি ঔষধ দিয়া পতঙ্গ মারা যায় ; (৭) পতঙ্গ মাউন্ট করা পিন, স্ট্রেচিং বোর্ড

ব্যবহার করা হয় যাহাতে পতঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া না যায়। (৮) ছিপি, শোলা বা পিচ-বোর্ড স্পেসিমেন বক্সের ধার-গুলিতে লাগাইবার জন্য, (৯) পতঙ্গ ধরিবার জাল, (১০) জলের জাল জলের পতঙ্গ ধরিবার জন্য জাল, (১১) নৈশ পতঙ্গ ধরিবার ফাঁদ, গুড় ও ভিনিগার মিশাইয়া গাছের গুঁড়িতে লাগাইয়া দেওয়া উচিত বা একটি আলোর কাছে রাখা উচিত, (১২) কাগজে পতঙ্গের নাম, স্থান ও সংগ্রাহকের নাম লিখিবে।



কীট-পতঙ্গ পরীক্ষা করিবার কাঁচের বাক্স

[পতঙ্গ ধরিবার জাল পৃঃ 60B চিত্র 1]

উদ্ভিদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ—জীব-বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে উদ্ভিদ সম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে থাকিলে চলিবে না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে হইবে। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ সংগ্রহ করিয়া তাহা ভালভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং পরে তাহা পরীক্ষা করিয়া তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। সকল সময়ে ফুল সমেত কোন উদ্ভিদের শাখা অথবা বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ হইলে সমগ্র উদ্ভিদ সংগ্রহ করা আবশ্যক, কেন না ফুলের বৈশিষ্ট্যের উপর উদ্ভিদের শ্রেণী-বিন্যাস হইয়াছে। পাতা ও ফুল সমেত কাণ্ডটি সংগ্রহ করিয়া ব্লটিং কাগজের দুই ভাঁজের মধ্যে ভালভাবে ছড়াইয়া দিতে হইবে, যাহাতে পাতাগুলি গুটাইয়া না যায়। ইহার উপর একটি চাপান রাখিবে। ইহার ফলে ব্লটিং কাগজ উদ্ভিদের দেহের জল শুষিয়া

লয়। পরপর কয়েকদিন ব্লটিং কাগজ পাল্টাইয়া দিবে। বেশ কিছুদিন পরে দেখিতে পাইবে পাতা, ফুল ও কাণ্ড শুকাইয়া গিয়াছে। ইহার একটি মোটা সাদা কাগজে ঐ উদ্ভিদটিকে আঠার দ্বারা আটকাইয়া দিবে। এই কাগজকে উদ্ভিদ-সংরক্ষণ কাগজ বলা হয়। মারকিউরিক ক্লোরাইড বা ন্যাপথ্যালিনের গুঁড়া ইহার উপর ছড়াইয়া দিবে। তাহা হইলে কোন কীট বা ছত্রাক ইহা নষ্ট করিতে পারিবে না। কাগজের ডানদিকের কোণে ইহার বিশদ বিবরণ লেখা আবশ্যক, যথা উদ্ভিদের নাম, শ্রেণী, সংগৃহীত স্থান, তারিখ ও সংগ্রাহকের নাম। তোমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে নানারকমের দেশী এবং বিদেশী, সাধারণ ও দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ—উদ্ভিদ-সংরক্ষণ কাগজে দেখিতে পাইবে। বহুবৎসর ধরিয়া ঐখানে সংরক্ষিত আছে।

রসাল ফল, স্ফীতকায় মূল বা স্ফীতকায় মৃদগত কাণ্ড পূর্বোক্ত উপায়ে সংরক্ষণ করা যায় না। প্রথমে ছোট ছোট কাঁচের জারে সাধারণতঃ ফর্মাল-অ্যাসিটিক-এ্যালকোহল রাখিতে হইবে। তৎপরে সংগৃহীত দ্রব্যগুলি উহার মধ্যে রাখিয়া মুখটি ভালভাবে বন্ধ করিতে হইবে। পরে উহাদের বিশদ বিবরণ কাগজে লিখিয়া জারের গাত্রে লাগাইয়া দিতে হইবে।

নানাধরনের নীরস ফল ও বীজ সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুকাইবার পর কাচের জারের মধ্যে রাখিয়া দিতে হইবে। উহাদের বিশদ বিবরণ কাগজে লিখিয়া কাচের জারে লাগাইয়া দিতে হইবে।

(১) **কয়েকটি সাধারণ পরীক্ষা**—বীজের জল শোষণের পরিমাণ—২০টি ছোলা বীজ লওয়া হইল এবং ইহার ওজন লওয়া হইল । ইহার পর একরাত্রি ঐগুলিকে জলে ভিজাইয়া রাখা হইল। তারপর ঐগুলিকে পুনরায় ওজন করা হইল। দ্বিতীয়-বারের ওজন হইতে প্রথমবারের ওজন বাদ দিলে শোষিত জলের

পরিমাণ জানা যাইবে। অতএব প্রত্যেকটি বীজের জল শোষণের ক্ষমতা আছে।

(২) **অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় পরিমাণ মত খাদ্যের প্রয়োজন—** কতকগুলি ছোলা বীজ লওয়া হইল। ইহাদের বীজপত্রগুলি নানাভাবে কাটা হইল। কাহারও বীজপত্র প্রায় কাটিয়া লওয়া হইল। কতকগুলি অক্ষত বীজ লওয়া হইল। এইবার ঐগুলিকে বাহ্যিক শর্তাবলী অর্থাৎ জল, অক্সিজেন ও পরিমিত উষ্ণতার মধ্যে রাখা হইল। কয়েক দিন পরে দেখা গেল যে, ছোলাটির বীজপত্র অর্থাৎ তাহার অঙ্কুরোদ্গম স্বাভাবিকভাবেই হইয়াছে। যাহাদের কিছুটা কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহাদের অঙ্কুরোদ্গম খুব ভাল হয় নাই। যাহাদের বীজপত্র প্রায় ছিল না বলিলেই চলে, তাহাদের অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই। ইহার দ্বারা বোঝা গেল যে, স্বাভাবিক অঙ্কুরোদ্গমের জন্য পরিমাণ মত খাদ্যের প্রয়োজন যাহা সমগ্র বীজপত্রে নিহিত থাকে।

(৩) **প্রজাপতির জীবন ইতিহাসের পরীক্ষা ঃ** বাগান হইতে কিছু শুঁয়াপোকা সংগ্রহ করা হইল। নীচে প্রদত্ত কাঁচের কেসে বা



একটি বড় কাঁচের জারে ঐগুলি এবং কিছু পাতা রাখা হইল। ঢাকনাটিতে ছোট ছোট গর্ত করিয়া লওয়া হইল। এইবার ঢাকনাটির দ্বারা কাঁচের জারের মুখটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। শুঁয়াপোকার পরিবর্তে পাতা সমেত ডিমগুলিও ইহার মধ্যে রাখা যাইতে পারে। এইবার কয়েকদিন ধরিয়া ভালভাবে

পর্যবেক্ষণ কর। ৬।৭ দিনের মধ্যে ডিম ফুটিয়া শুঁয়াপোকা বাহির হইবে। ইহার দেহটিকে পর্যবেক্ষণ কর। ইহারা ক্রমাগত গাছের পাতা খাইতে থাকে। ইহারা এই অবস্থায় প্রায় ৩।৪ সপ্তাহ থাকে। তারপর ইহারা নিশ্চল হইয়া যায়। পরে ইহার চারিদিকে একটি শক্ত আবরণের সৃষ্টি করে। এই দশাকে পিউপা বলা হয়। এই অবস্থা প্রায় এক সপ্তাহ থাকে। তাহার পর তোমরা দেখিবে যে, একটি সুন্দর প্রজাপতি উহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জারের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছে। এই পরিবর্তনকে রূপান্তর বলা হয়। বহু কীট-পতঙ্গের জীবন ইতিহাসে রূপান্তর দেখিতে পাইবে।

প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায়

(১) উদ্ভিদ জগতের শ্রেণী বিভাগ কর।

(২) অপুষ্পক ও সপুষ্পক উদ্ভিদের পার্থক্য কি ?

(৩) সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কি কি ?

(৪) শৈবাল ও ছত্রাকের মধ্যে পার্থক্য কি কি ?

(৫) ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদ কাহাকে বলে ?

(৬) একবীজপত্রী ও দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলির উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

(৭) নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির মধ্যে কোন্‌টি মোলাস্কা পর্বে পড়ে ?— (ক) একটি স্পঞ্জ, (খ) একটি শামুক, (গ) প্রজাপতি, (ঘ) কেঁচো।

(৮) উপরোক্ত প্রাণীগুলির পর্ব নাম কর ও কোন্ পর্বটিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় প্রজাতি আছে লিখ।

(৯) দশটি প্রাণিপর্বের প্রধান লক্ষণগুলি লিখ।

(১০) (ক) আরশোলা অন্য প্রাণী হইতে পৃথক করা যাইতে পারে তাহাদের সন্ধিল উপাঙ্গের দ্বারা, (খ) চিংড়ি, কাঁকড়া, মাকড়সা, বিছা একই পর্বে ধরা হয়, (গ) আমাদের গৃহের বিড়ালকে কর্ডাটা পর্বে ফেলা হয় কারণ সে মাংসাশী।—উপরোক্ত বাক্যগুলির সত্যাসত্য বিষয় মন্তব্য কর।

(১১) বহিরাকৃতি দেখিয়া ঠিক কর একটি কেঁচো ও একটি পাইলা কোন্ পর্বে পড়ে।

(১২) কোন্ কোন্ লক্ষণ দেখিয়া ঠিক করিবে যে, শামুক ও ঝিনুক এক পর্বে পড়ে ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১) স্থানিক ও অস্থানিক মূলের পার্থক্য নিরূপণ কর।

(২) অস্থানিক মূল কি কি বিশেষ কাজের জন্য পরিবর্তিত হইয়াছে ? উদাহরণসহ তাহাদের বর্ণনা কর।

(৩) নিম্নলিখিত কোন্‌গুলি পরিবর্তিত স্থানিক ও অস্থানিক মূল তাহা দেখাও :

(ক) মূলকাকার ; (খ) গুচ্ছিত মূল ; (গ) শালগমাকার ; (ঘ) পরাশ্রয়ী মূল ; (ঙ) শাঙ্কব ; (চ) স্তম্ভমূল ; (ছ) ঠেস মূল।

(৪) অস্থানিক মূল উদ্ভিদের কোন্ কোন্ অংশ হইতে উদ্ভূত হয়।

(৫) আদা মূল নয় কেন, তাহা প্রমাণ কর।

(৬) মৃদ্‌গত কাণ্ড কি কি ? তাহাদের বহিরাকৃতি বর্ণনা কর।

(৭) নিম্নলিখিত পরিবর্তিত কাণ্ডগুলির বিশেষ কাজ কি কি ?

(ক) গ্রন্থি কাণ্ড ; (খ) তোরণধাবক ; (গ) শাখা কণ্ঠক।

(৮) একটি আদর্শ পত্রের বিভিন্ন অংশ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

(৯) একক ও যৌগিক পত্রের মধ্যে পার্থক্য কি কি ?

(১০) শিরা-বিন্যাস কয় প্রকার ? প্রধান প্রধান শিরা-বিন্যাস বর্ণনা কর।

(১১) একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর।

(১২) গর্ভপাদ, গর্ভকাঠি ও গর্ভশীর্ষ ফুল বলিতে কি বুঝ, তাহা বর্ণনা কর।

(১৩) মৌলিক, গুচ্ছ ও যৌগিক ফল বলিতে কি বুঝ ?

(১৪) শুষ্ক ও রসাল ফলের মধ্যে পার্থক্য কি কি ?

(১৫) একটি অশস্যল দ্বি-বীজপত্রী বীজের বর্ণনা কর।

(১৬) একটি পাখির বহিরাকৃতি বর্ণনা কর। তিনটি লক্ষণ হইতে নিরূপণ কর যে, ইহার দেহ উড়িবার জন্য উপযুক্ত।

(১৭) একটি সাধারণ মাছের বহিরাকৃতি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর। জলে বাসের উপযোগী কোন্ কোন্ অঙ্গ আছে ?

(১৮) একটি টোড ও একটি গিরগিটির বাহিরাকৃতি তুলনা কর।

(১৯) আত্মরক্ষার-জন্য এই প্রাণিগুলির অঙ্গগুলির নাম কর : (ক) ভেটকি মাছ ; (খ) টোড ; (গ) গিরগিটি।

(২০) কোন্ অঙ্গগুলি দেখিয়া বুঝিবে যে, একটি মাছ, ব্যাঙ, গিরগিটি, পায়রা ও গিনিপিগ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী ?

(২১) (ক) মাছের সহিত ব্যাঙের, (খ) গিরগিটির সহিত পাখির কি কি সাদৃশ্য আছে ?

(২২) ভেটকি মাছ, ব্যাঙ ও গিরগিটির সহিত একটি গিনিপিগের বহিরাকৃতির লক্ষণগুলির কি কি প্রভেদ ?

(২৩) আরশোলা ও প্রজাপতির বহিরাকৃতির মধ্যে মিলগুলি লিখ।

(২৪) নিম্নলিখিত প্রাণী কিভাবে চলে, (ক) আরশোলা ; (খ) প্রজাপতি ; (গ) মাছ ; (ঘ) ব্যাঙ ; (ঙ) গিরগিটি ; (চ) পায়রা ; (ছ) গিনিপিগ।

(২৫) উপরোক্ত প্রাণীগুলির ইন্দ্রিয় স্থানগুলির সম্বন্ধে কিছু লিখ।

(২৬) পায়রার কত রকমের পালক আছে ?

(২৭) নিম্নলিখিত অঙ্গের কি কি কার্য ? (ক) আরশোলার অ্যানটেনা ; (খ) প্রজাপতির প্রোবোসিস ; (গ) মাছের আঁশ ; (ঘ) মাছের নাসারন্ধ্র ; (ঙ) টোডের পশ্চাৎপদ ; (চ) পাখি ও গিরগিটির নখর ; (ছ) গিনিপিগের লোম।

তৃতীয় অধ্যায়

(১) অঙ্কুরোদ্গমের জন্য তিনটি বাহ্যিক শর্তের বিবরণ দাও।

(২) তিনটি শর্ত অঙ্কুরোদ্গমের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়, তাহা পরীক্ষা-সহ বর্ণনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

(১) প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের নাম কর। চাউল কোন্ কোন্ দেশের প্রধান খাদ্য। চাউল হইতে কি কি প্রস্তুত হয় ?

(২) প্রধান প্রধান ডাল জাতীয় খাদ্যের বর্ণনা কর।

(৩) নারিকেল গাছ অর্থকরী উদ্ভিদ কেন ?

(৪) পাট কয় প্রকার ? কোন্ জমিতে পাট ভাল হয় ? পাটজাত দ্রব্যের নাম কর।

(৫) তুলা গাছ আমাদের প্রয়োজনীয় কেন ?

(৬) রেশমগুটির বিষয় যাহা জান বর্ণনা কর।

(৭) রেশম শিল্পের অর্থ কি ?

(৮) একটি ভেড়ির বর্ণনা কর।

(৯) পোল্‌ট্রি কোন্ কোন্ প্রাণীদের বলা হয়? ইহাদের বিষয় একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ।

(১০) গরুর উপকারিতা বিষয় একটি রচনা লিখ।

(১১) সংক্ষিপ্ত টিকা লিখঃ (ক) শ্বেত বিপ্লব; (খ) হরিয়ানা গোরু; (গ) মাছের নানা ব্যবহার।

পঞ্চম অধ্যায়

(১) আমাদের খাদ্যের প্রধান উপাদান বিষয়ে একটি রচনা লিখ।

(২) সংক্ষিপ্ত টিকা লিখ: (ক) মাছ; (খ) মাংস; (গ) শ্বেতসার; (ঘ) ডিম; (ঙ) দুধ।

(৩) কি কি গুণ প্রোটিনের?

ষষ্ঠ অধ্যায়

(১) পেনিসিলিয়াম আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ কেন?

(২) পেনিসিলিনকে 'সর্বরোগহর' বলা হয় কেন?

(৩) সর্পগন্ধা চিকিৎসাশাস্ত্রে খুব প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ কেন? কি কি ধরনের রোগ সারে?

(৪) ধুতুরা গাছের কোন্ অংশটি বিষাক্ত?

(৫) গৃহের মাছি কোন্ কোন্ রোগ ছড়ায়?

(৬) কিউলেক্স ও অ্যানোফিলিস মশা আমাদের কি ক্ষতি করে?

(৭) মাছি ধ্বংস করার কি কি উপায় আছে?

(৮) ইঁদুর কি ভাবে আমাদের ক্ষতি করে?

(৯) ইঁদুর ধ্বংস করার উপায়গুলির বিশদ বর্ণনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

(১) উদ্ভিদকে কিভাবে সংরক্ষণ করিবে, তাহা বর্ণনা কর।

(২) ভ্রূণ মূল সর্বাগ্রে বীজ হইতে বাহির হয় তাহা পরীক্ষা সহকারে দেখাও।

(৩) প্রজাপতি কিভাবে ধরা হয় ও তাহার জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে কিভাবে পরীক্ষা করা হয় ?

(৪) পুকুর হইতে প্রাণী ধরিয়া কিভাবে কাঁচের জারে সংরক্ষণ করা হয় ?

(৫) মশার ধ্বংস কি ভাবে হইতে পারে তাহার জন্য একটি পরীক্ষার বিবরণ দাও।

(৬) যদি জীবন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ না পাওয়া যায় অন্য কিভাবে তাহাদের বিষয় জ্ঞান লাভ করা যায় ?
